কন্যাশিশু * ২০২৫

কন্যাশিশু

The Hunger Project. BANGLADESH

জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম
National Girl Child Advocacy Forum

জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম

কন্যাশিশু -২৫

জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-২০২৫ উপলক্ষে বিশেষ প্রকাশনা

সম্পাদনায়

ড. বদিউল আলম মজুমদার

সেপ্টেম্বর, ২০২৫

The Hunger Project. BANGLADESH

জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম
National Girl Child Advocacy Forum

কন্যাশিশু-২৫
জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-২০২৫ উপলক্ষে বিশেষ প্রকাশনা

সম্পাদক
ড. বদিউল আলম মজুমদার

নির্বাহী সম্পাদক
নেসার আমিন

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
আহসানা জামান এ্যানি

প্রকাশকাল
৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

মুদ্রণ
ইনোসেন্ট ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল
১৪৭/১ আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা-১২০৭।

ISBN Number: 978-984-35-8380-2

প্রকাশক
জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম
সচিবালয়: দি হাঙ্গার প্রজেক্ট ২/২, মিরপুর রোড, (লেভেল: ৪)
ব্লক: এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা- ১২০৭ ।
ওয়েব: www.girlchildforum.org
ফেসবুক: www.facebook.com/ngcaf

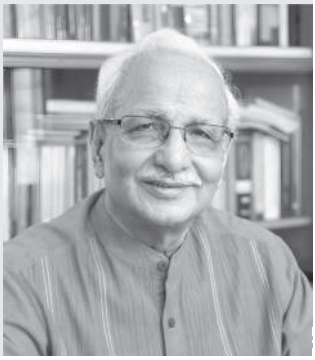

ড. বদিউল আলম মজুমদার
সভাপতি
জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম

সম্পাদকীয়

প্রতিবছরের ন্যায় এবারও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ৩০ সেপ্টেম্বর জাতীয় কন্যাশিশু দিবস উদ্‌যাপিত হবে। এবারের প্রতিপাদ্য হচ্ছেঃ 'আমি কন্যাশিশু – স্বপ্নে গড়ি, সাহসে লড়ি, দেশের কল্যাণে কাজ করি'। এই প্রতিপাদ্যের মূল তাৎপর্য হলো, কন্যাশিশুদের আত্মমর্যাদা, দক্ষতা, সাহসিকতা অর্জন ও নেতৃত্বদানে উদ্বুদ্ধ করা। সে জন্য তাদের বিকাশে ইতিবাচক ও সহায়ক পরিবেশ গড়ে তোলার দিকগুলো আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি করা। বিশেষ করে, কন্যাশিশুদের অগ্রগতিতে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাগুলোর বিপরীতে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে কী কী করণীয় রয়েছে, তা নিয়ে আলোচনা এবং সমাধানের পথ খুঁজে বের করা।

এই প্রতিপাদ্য কেবল কন্যাশিশুদের জন্যই নয়, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের অগ্রগতির জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়নের বহুল পরিচিত উক্তি আমরা সবাই জানি, 'আমাকে একজন শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাদের একটা সভ্য, শিক্ষিত জাতি উপহার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।' নেপোলিয়নের এ উক্তি এখন আরও বেশি প্রাসঙ্গিক। নেপোলিয়ন দু'শ বছরেরও আগে উপলব্ধি করেছিলেন যে, সমাজকে সভ্য ও শিক্ষিত করতে আগে মা-দের শিক্ষিত করতে হবে। কারণ, যে কোনো সন্তান শৈশবে মায়ের সান্নিধ্যেই বেশি থাকে– তা ছেলেশিশু হোক অথবা কন্যাশিশু হোক।

আমরা মনে করি, নারী ও কন্যাশিশুদের প্রতি বঞ্চনা-বৈষম্য দূর করা এবং শিক্ষা ও পুষ্টি-সহ তাদের প্রয়োজনীয় ও প্রাপ্য সব অধিকার নিশ্চিত করা দরকার। দরকার তাদের মধ্যে স্বপ্ন ও সাহস গড়ে তোলা, যাতে তারা পরিবার ও দেশের কল্যাণে কাজ করতে পারে। সবার আগে দরকার সর্বস্তরে নারীদের প্রতি তথাকথিত পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। কারণ নারীর প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হলে, সামাজিক লিঙ্গীয় বৈষম্য দূর হলে সমাজ আপন গতিতেই বদলে যাবে, নারী ও কন্যাশিশুরাও পাবে তাদের ন্যায্য অধিকার।

প্রসঙ্গত, কন্যাশিশুদের সার্বিক নিরাপত্তা এবং তাদের অধিকার আদায়ের জন্য ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করছে 'জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম'। ২০০০ সাল থেকে এ ফোরাম-এর উদ্যোগে প্রতিবছর ৩০ সেপ্টেম্বর জাতীয় কন্যাশিশু দিবস পালিত হয়ে আসছে।

বর্তমানে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সচেতন মানুষ।

জাতীয় কন্যাশিশু দিবস উদ্‌যাপন শুধু কোনো আনুষ্ঠানিকতা মাত্র নয়। বরং কন্যাশিশুদের নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিতের লক্ষ্যে গণমানুষকে সচেতন করা এ দিবসের অন্যতম লক্ষ্য। একইসঙ্গে কন্যাশিশুদের কল্যাণে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে আরও বেশি পরিমাণে কর্মসূচি গ্রহণ এবং অঙ্গীকার সৃষ্টিও এ দিবস উদ্‌যাপনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

আমরা মনে করি, কন্যাশিশুর অধিকার নিশ্চিককরণের সামাজিক আন্দোলনকে বিস্তৃত করার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো প্রকাশনা। এমন অনুধাবন থেকে প্রতিবছরের ন্যায় এবারও দেশের ১৬ জন খ্যাতনামা লেখকের প্রবন্ধ নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে 'কন্যাশিশু-২০' শিরোনামে একটি বিশেষ প্রকাশনা। প্রকাশনায় স্থান পাওয়া প্রবন্ধসমূহে লেখকগণ নারী ও কন্যাশিশুদের অবস্থা ও অবস্থান তুলে ধরার পাশাপাশি জাতির সমৃদ্ধি আনয়নের লক্ষ্যে তাদের অধিকার নিশ্চিত করা ও তাদের জন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। বিশেষ করে তাঁরা বাল্যবিবাহ, যৌতুক, পাচার-সহ বিভিন্ন সামাজিক কুপ্রথার কারণ এবং এগুলো বন্ধের উপায়সমূহ অনুসন্ধান করেছেন। উল্লেখ্য, পূর্বের ন্যায় এবারও নিবন্ধসমূহ লেখকের নামের বর্ণানুক্রমে সাজানো হয়েছে।

সংকলনটির জন্য নিবন্ধ সংগ্রহ, সম্পাদনা এবং জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম-এর সদস্য ও কার্য-নির্বাহী কমিটির তালিকা প্রস্তুত প্রক্রিয়া এবং এর সঙ্গে জড়িত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। কন্যাশিশুদের জন্য একটি সুন্দর আগামীর প্রত্যাশায় যাঁরা তাদের মূল্যবান নিবন্ধ পাঠিয়ে সংকলনটিকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। ভুল-ত্রুটি ও মুদ্রণপ্রমাদ থাকলে পাঠকের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি প্রত্যাশা করছি।

আমার বিশ্বাস, 'কন্যাশিশু-২০' প্রকাশনায় অন্তর্ভুক্ত মূল্যবান দিক-নির্দেশনামূলক লেখাগুলো কন্যাশিশুদের অধিকার রক্ষার আন্দোলনকে আরও অর্থবহ ও বেগবান করবে।

ড. বদিউল আলম মজুমদার
৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

সূচিপত্র

অধরা শ্রেয়সী অথই	মেয়েরা স্বাবলম্বী হচ্ছেন, আমাদের ছেলেরা সাবালক হবেন কবে?	০৭
আমিনুল ইসলাম সুজন	নারী ও শিশুদের সুরক্ষায় ধূমপানমুক্ত পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনের গুরুত্ব	১১
সৈয়দা আহসানা জামান (এ্যানী)	কেমন আছে বাংলাদেশের কন্যাশিশুরা?	১৭
গ্লোরিয়াস গ্রেগরী দাস	কন্যাশিশুর কান্না	২৩
ড. আলেয়া পারভীন	বেশ্যা, নারী কুশপুত্তলিকা ও নতুন বাংলাদেশ	২৫
ড. তানিয়া হক	কন্যাকে কন্যাশিশু নয়, মানুষ হিসেবে মূল্যায়ন করতে হবে	২৮
ড. বদিউল আলম মজুমদার	সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্বের কোন পদ্ধতি যথাযথ	৩২
ডা. হালিদা হানুম আখতার	বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ: একটি বিশ্লেষণ	৩৭
ফরিদা ইয়াসমিন	একজন হিটু শেখ ও আমাদের কন্যাশিশু	৪২
বাবুল চন্দ্র সূত্রধর	কন্যাশিশুর সুরক্ষায় দরকার নতুন ভাবনা	৪৬
মিথুশিলাক মুরমু	নিরাপত্তাহীনতায় আদিবাসীদের বাল্যবিবাহ!	৫২
মোহাম্মদ ইয়াসিন আরাফাত	পরিবারে শিশুর নির্যাতন ও প্রতিকার	৫৫
লাভলী মানসী দাজেল	কন্যাশিশু ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্যতা	৫৯
রহমান মৃধা	আসছে কন্যাশিশু দিবস প্রতীক নয়, চাই বাস্তব পরিবর্তন	৬৩
সাদিয়া করিম	অদম্য ইচ্ছেশক্তি দিয়ে স্বপ্নকে সত্য করি, নতুন সমাজ বিনির্মাণ করি	৬৬
সুব্রত ব্যানার্জী	ধর্ষণ ও যৌন হয়রানি প্রতিরোধে করণীয় কী?	৬৮

WE
WANT
JUSTICE

অধরা শ্রেয়সী অথই

❖ মেয়েরা স্বাবলম্বী হচ্ছেন, আমাদের ছেলেরা সাবালক হবেন কবে?

নারীর অধিকার, নারীর ক্ষমতায়ন, সমাজে নারীর প্রতি বৈষম্য এবং এই প্রেক্ষাপটে তাঁদের করণীয় নিয়ে আমাদের সমাজে একটা ধারাবাহিক আলোচনা সবসময়ই জারি আছে। হঠাৎ চিন্তা করলে মনে হয় যেন সব বলা হয়ে গেছে। কিছু আর আমাদের বলার বাকি নেই। কিন্তু এই কথামালার দিকে তাকালে, এর বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে, বড়ো একপেশে এসব কথা। এ বিষয়ক বুদ্ধিবৃত্তিক ডিসকোর্সের একটা অসমতা কিছুতেই আমি চোখ এড়াতে পারি না। সেটিই এখানে বলার চেষ্টা করব।

আমার আশেপাশে এখন অনেকেই নতুন মা-বাবা হচ্ছেন, কন্যাসন্তানকে ঘিরে তাঁদের বিস্তৃত স্বপ্ন রয়েছে। তাঁরা মেয়েদেরকে পড়াশোনা, ঘরের কাজ থেকে শুরু করে আত্মরক্ষা পর্যন্ত শেখাচ্ছেন। পরিসংখ্যান বলে, আমাদের মেয়েরা সুযোগ পেলে পড়াশোনায় ছেলেদের তুলনায় এগিয়ে থাকে। মানুষের সচেতনতা বাড়ছে, মেয়েরা কর্মজীবনেও প্রবেশ করছেন, এমনকি করোনার সময় মেয়েদের ক্ষুদ্র ব্যবসার একধরনের বুম তৈরি হয়েছে। কিন্তু তাই বলে পুরানো দায়িত্বগুলো থেকে কিন্তু তাঁদের কোনো মুক্তি নেই। অফিস শেষে তাঁরা ঘরের স্ত্রী, ঘরের মা। নারীরা একইসঙ্গে তাঁদের পুরনো ভূমিকা পালন করছেন এবং নতুন নতুন ক্ষেত্রেও নিজেদের জায়গা করে নিচ্ছেন।

কিন্তু এই যে আমরা আমাদের কন্যাদেরকে সর্বজয়া, শতভূজা করে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখছি, সেই আমরা আমাদের পুত্র সন্তাদেরকে কেন এসব বিষয়ে সমান শিক্ষিত করে তুলছি না? এই পুরো ডায়ালগের মধ্যেই পুত্র সন্তানদের অদ্ভুত একটা অদৃশ্যমানতা (ইনভিজিবিলিটি) লক্ষ করা যায়। তাদের ব্যাপারে এক ধরনের অ্যাভয়ডেন্স আমাদের গোটা আলোচনায়। যেন তাঁদের এখানে কোনো দায় নেই, কিছু শেখার বা করার নেই। একদিকে আমরা মেয়েদেরকে আত্মরক্ষার চর্চা করতে শেখাচ্ছি ছোটবেলা থেকেই; সমাজে তাঁদের বিপদগুলো এতো বেশি নরমালাইজড আমাদের কাছে, অন্যদিকে আমরা ছেলে সন্তানদের সঙ্গে এই বিষয়ে কোনো রকমের কোনো আলোচনাতেও কেন যাচ্ছি না? কেন আমরা তাদেরকে এ বিষয়ে অবগত করছি না যে, সচেতন না থাকলে

তারা বা তাদের বন্ধুরাই একসময় মেয়েদের জন্য কোনো না কোনোভাবে হুমকি হয়ে উঠতে পারেন। কেন আমরা তাদেরকে সাংসারিক দায়িত্বের সমবণ্টন শেখাচ্ছি না? তাদেরকে দেখাচ্ছি যে, মা-বোন-স্ত্রী নির্বিশেষে মেয়েরাই সবসময় কেয়ারগিভারের দায়িত্ব পালন করেন। সকল দায় কেবল মেয়েদের। নতুন যুগে নয়া নয়া চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবেন আমাদের মেয়েরা, আবার সেসব চ্যালেঞ্জ ডিঙিয়ে ভালো মা, ভালো স্ত্রী, ভালো সহকর্মী, ও নম্র-ভদ্র হবার দায়ও তাদেরই। শুধু তাদের।

এইসব চর্চার ফলশ্রুতিতে আসে নারীদের মাতৃত্ব পরবর্তী কর্মজীবনের সেই চিরাচরিত ডিলেমা। তাঁরা চাকরি রক্ষা করবেন, না মাতৃত্ব? সন্তান জন্মদানের পর কর্মজীবন ত্যাগের হার আমাদের মধ্যে আশঙ্কাজনক রকমের বেশি। সন্তানটি কিন্তু নারী ও পুরুষ উভয়েরই, অথচ, জন্মদানের কনসিকোয়েন্স প্রায় পুরোটাই ভোগ করতে হয় নারীকে। সেদিন দেখলাম, মাতৃত্বকে একটি সফল ক্যারিয়ারের মতোই আরেকটা ক্যারিয়ার হিসেবে দেখতে বলছেন ইলন মাস্ক (বলা বাহুল্য, কিন্তু নোট করা গুরুত্বপূর্ণ যে, তিনি নিজে নারী অথবা মাতা নন)। সেই কথার সঙ্গে দ্বিমত জানিয়ে আমার এক বন্ধু লিখেছেন, মা হবার আগেই ক্যারিয়ারটাকে গুছিয়ে নিতে। তারপর নারী সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন কখন তিনি সন্তান নেবেন, কিংবা আদৌ তিনি সন্তান নিতে চান কিনা। অর্থাৎ, ক্যারিয়ারের কথা চিন্তা করে মাতৃত্ব বিসর্জন কিংবা মাতৃত্বের কথা চিন্তা করে ক্যারিয়ার বিসর্জন, কিংবা নিজের জীবনটাই উৎসর্গ করে এই দুটিতে সমান তালে ভূমিকা রাখার কথা নারীর বেলায় আমরা ভাবতে পারছি; তবুও আমাদের মাথায় আসছে না, আমরা ছেলেদেরকেও এই আলাপচারিতায় যুক্ত করতে পারি! তাদেরও এখানে একটা রোল প্লে করার দায় থাকে, দায়িত্ব থাকে। যে দায়িত্ব পালন করলে কর্মজীবী মায়েদের আর এই বাইনারি চয়েসের মধ্যে থাকতে হতো না। আদর্শ মা, মমতাময়ী মা, মায়ের ত্যাগ– মায়েদের নিয়ে আমাদের বিশেষণের কোনো শেষ নেই। কিন্তু আমরা কেন পিতৃত্বের প্রত্যাশা নিয়ে একইভাবে কথা বলি না? পিতার কাজ যদি শুধুই টাকা আয় করা হয়, তাহলে যে পরিবারে মায়েরা টাকাটাও আয় করেন, সেই পরিবারের বাবাদের কি আর কোনো দায়-দায়িত্ব থাকে না? কেন আমরা এভাবে সম্মিলিতভাবে পুরুষদের দায়মুক্তি দিয়ে দিলাম?

'ম্যারিড সিঙ্গেল মাদার' নামে নতুন এক ধরনের টার্ম ইদানিং আমার প্রায়ই চোখে পড়ছে। এ হলো এমন এক ধরনের মা, যারা সন্তান লালন-পালন সহ গৃহস্থালির সকল দায়িত্ব একাই পালন করেন। মানসিকভাবে এবং বাস্তবিকই তাদের অবস্থা একা মায়েদের (সিঙ্গেল মাদার) মতো। যেসব মায়েরা চাকরি করেন, তাঁদের ক্ষেত্রে বিষয়টা আরও ভয়াবহ। ফুলটাইম চাকরি করার পরও তাঁদের একা একাই সন্তান ও গৃহস্থালি সামলাতে হয়। এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে সংসার ও সন্তানের দেখাশোনা কে, কীভাবে, কতটুকু, কী করবেন তার পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিকল্পনা ও নির্দেশনা দিতে হয় ওই মাকেই। ফলে, কিছু

কাজ নিজে না করলেও তার শতভাগ মানসিক বিনিয়োগ থাকে সংসারে, সন্তানে, এর সঙ্গে কর্মজীবন তো আছেই।

এই যে একটা অমানসিক প্রত্যাশার চাপ আমরা নারীদেরকে দিচ্ছি, এর কোনো প্রয়োজন ছিল না। আমরা যদি আমাদের ছেলেশিশুদেরকে পরিবারের এবং জীবন-যাপনের মৌলিক দায়িত্বগুলো পালন করতে শেখাতাম, যদি আমরা যেকোনো প্রকারে একটি বেতনভুক্ত চাকরি করাকেই তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য না বানিয়ে জীবনে যেসব ভূমিকায় তাদেরকে অবতীর্ণ হতে হয়, সেগুলোর পেছনের দায়িত্বের ব্যাপারে তাদেরকে শিক্ষিত করে তুলতাম এবং জবাবদিহিতার আওতায় রাখতাম, তাহলে আর আমাদের মেয়েদের একটা বয়সে যেয়ে একা বসে ভাবতে হতো না, বাচ্চা নেওয়ার পর সে কীভাবে চাকরি করবে। আমাদের বাবাদের কি কখনো এটা ভেবে দেখতে হয়েছে?

বলে রাখা জরুরি মনে করছি যে, যাপনের এই শিক্ষা মানে কিন্তু কালেভদ্রে একবার বিরিয়ানি রান্না করা, কিংবা মেহমান বাসায় আসলে তাঁদের জন্য একটি স্পেশাল আইটেম রান্না করে 'তাক লাগিয়ে দেওয়া' নয়। এগুলোকে আমার নিতান্তই পার্ফমিটিভিটি বলে মনে হয়, যা কিনা প্যাসিভিটির চেয়েও ক্ষতিকারক। কিন্তু সে আলাপ অন্যদিন। এই শিক্ষা সার্বিক, আড়ম্বরহীন গার্হস্থ্য শিক্ষা, যা আমাদের মেয়েরা শিখে ও করে আসছেন সারাজীবন ধরে। ছোটবেলা থেকে এই শিক্ষা পেলে আমার ধারণা আমাদের ছেলেরা আরও বেশি সহমর্মী হয়ে উঠবেন মেয়েদের প্রতি, এবং সার্বিকভাবে জীবনের প্রতিই। তারা সংসারকে, ঘরবাড়ির ধুলাকে নিজের চোখে দেখতে শিখবেন। এই উপায়ে যদি আমরা আমাদের সন্তানদের বড়ো করতে পারি, তাহলে, আমার মনে হয়, আমাদের কন্যাশিশুদের জন্য আমরা জীবনটা কিছুটা সহজ করে যেতে পারব।

এজন্য প্রথমেই আমাদেরকে সমস্যাটার ধরন বুঝতে হবে, এর অস্তিত্ব স্বীকার করতে হবে। সমাধানের প্রয়োজন অনুভব করতে হবে, মন থেকে। এটাকে কেবল থিওরেটিক্যালি বইপত্রের আলাপ বা বুদ্ধিবৃত্তিক ইস্যু হিসেবে ডিল করলে চলবে না, আমাদের যাপনের একটি অংশ হিসেবে এর চর্চা করতে হবে। আমাদের সন্তানদের সামনে উদাহরণ তৈরি করতে হবে যেন তারা এটা দেখে বড় না হন যে, বাবা অফিস থেকে ফিরে টিভি দেখছেন, আর অফিস-ফেরত মা এসেই সোজা রান্নাঘরে ঢুকছেন। অথবা বাবা পুরোপুরিভাবে সংসার-বিচ্ছিন্ন একটি মানুষ এবং মাকে তারও দেখভাল করতে হচ্ছে। গণ-মাদারিংয়ের এই সংস্কৃতি থেকে আমাদের মেয়েদের বেরিয়ে আসতে হবে। কন্যাশিশুদেরকে এ বিষয়ে সচেতন করতে হবে। ছেলেদেরকে সাংসারিক দায়িত্ব, কর্তব্য ও নিজেকে ম্যানেজ করতে পারা শেখাতে হবে।

নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে ভাবতে গেলে দেখা যায়, বাংলাদেশে মাতৃত্বকালীন ছুটির চল

আছে, কিন্তু পিতৃত্বকালীন ছুটি নেই। এটা আসলে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পুরুষদের দায়মুক্তি দেওয়ার এক প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি। সন্তান জন্মের দায়িত্ব মা যেমন এড়াতে পারেন না, তেমনি বাবারও সেই মুহূর্তে পাশে থাকার দায় অস্বীকার করার সুযোগ থাকা উচিত নয়। পুরুষদের জন্য পিতৃত্বকালীন ছুটির চর্চা শুরু করতে হবে। অফিসগুলোতে মা ও বাবাদের জন্য নমনীয় কর্মঘণ্টা এবং চাইল্ডকেয়ার সুবিধা চালু করতে হবে।

এছাড়া, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা কখনো সূক্ষ্মভাবে আবার কখনো প্রকাশ্যেই লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যকে টিকিয়ে রাখে। বিষয় বাছাই থেকে শুরু করে শিক্ষক-সহপাঠীর আচরণ, পাঠ্যবইয়ে থাকা স্টেরিওটাইপ, কিংবা সুযোগ-সুবিধা বণ্টনে বৈষম্য, সব জায়গায় এই চর্চা দেখা যায়। যার প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়ে আমাদের মেয়েদের ওপর। ফলে একদিকে যেমন তাঁদের বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়, অন্যদিকে সমাজে বৈষম্যের চক্রটা আরও শক্ত হয়। স্কুল থেকে শুরু করে কলেজ পর্যন্ত গার্হস্থ্য দায়িত্ব, যত্নশীলতা, সহমর্মিতা এসব বিষয়কে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে জেন্ডার নির্বিশেষে। সকল স্তরের শিক্ষকদেরকে জেন্ডার সেন্সিটিভিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। আমাদের পাঠ্যপুস্তকে, মিডিয়া এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় এই বিষয়ক প্রচুর কন্টেন্ট তৈরি করতে হবে। একে শুধু 'জেন্ডার ইস্যু' নামক একটি বাবলের মধ্যে আটকে ফেললে চলবে না। আমাদের দৈনন্দিন জীবন ও বোঝাপড়ার অংশ করে ফেলতে হবে। ছেলে ও মেয়েদের মাঝে সাংসারিক দায়িত্ব-কর্তব্যের সমবণ্টনকে একটি নর্ম বানিয়ে ফেলতে হবে।

সবশেষে, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পর্যায়ে আমাদের জরিপ ও গবেষণার মাধ্যমে নিয়মিত হিসাব রাখতে হবে, পুরুষেরা গৃহকাজে কত সময় ব্যয় করছেন, সন্তানের যত্নে তাঁদের ভূমিকা কতটা বেড়েছে। যতদিন না এই সংখ্যাগুলোতে বাস্তব পরিবর্তন আসছে, ততদিন নারীর মুক্তি, নারীর ক্ষমতায়নের আলাপগুলো সিসিফাসের পাথরের মতনই নারীর কাঁধে চেপে বসবে।

লেখক: প্রভাষক, জার্নালিজম অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ, সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটি।

আমিনুল ইসলাম সুজন

❖ নারী ও শিশুদের সুরক্ষায় ধূমপানমুক্ত পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনের গুরুত্ব

আমরা ধূমপান ও তামাক সেবনের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে কমবেশি জানি। তারপরও মানুষ এ নেশায় আসক্ত হয়, ফুসফুস ও মুখ গহ্বরের বিভিন্ন ক্যান্সার, হৃদরোগ, স্ট্রোক, ফুসফুস ও শ্বাসনালীর রোগসহ প্রাণঘাতী রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়ার কথাও জানি। কিন্তু আমরা কতটা পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতি সম্পর্কে জানি? পরোক্ষ ধূমপান-ই বা কী?

একজন ব্যক্তি নিজে ধূমপায়ী না হলেও আশপাশে, বাসাবাড়িতে, পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহনে কোনো ধূমপায়ীর পাশে অবস্থান করলে ধূমপায়ীর নির্গত বিড়ি-সিগারেটের ধোঁয়া নিঃশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করাকে পরোক্ষ ধুমপান বলে। অর্থাৎ ব্যক্তি ধূমপান করে না, কিন্তু অন্য কোনো ব্যক্তি তার পাশে ধূমপান করলে ধূমপায়ী ব্যক্তি যে ধোঁয়া বাতাসে ছেড়ে দেয় তা নিঃশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করাই পরোক্ষ ধূমপান। ধূমপানের মতোই পরোক্ষ ধূমপানও মারাত্মক ক্ষতিকর ও প্রাণঘাতী। এ লেখায় পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতি, প্রতিরোধে বিদ্যমান আইনি বিধি-বিধান ও করণীয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি) এর গবেষণার আলোকে ইউএস সার্জন জেনারেলের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১০-এ বলা হয়েছে, বিড়ি-সিগারেটের ধোঁয়ায় মিথানল, টার/আলকাত্রা, ডিডিটি, নেপথালিন, কার্বন

মনোক্সাইড, নিকোটিনসহ সাত হাজারের (৭,০০০) বেশি ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে। তার মধ্যে ২৫০টি রাসায়নিক মারাত্মক ক্ষতিকর, যেগুলো মানবদেহে বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি সৃষ্টির জন্য দায়ী। তন্মধ্যে, আচেটালডিহাইড, আর্সেনিক, বেনজিন, ক্যাডমিয়াম, ফরমালডিহাইড, হাইড্রজিন, লেড, নিকেল, পলিসাইক্লিক এরোমেটিক হাইড্রোকার্বন, রেডিওঅ্যাকটিভ এলিমেন্টস (ইউরেনিয়াম-২৩৫, পলোনিয়াম ২১০) সহ ৭০টির অধিক রাসায়নিক মানবদেহের বিভিন্ন অংশে প্রাণঘাতী ক্যান্সার রোগ সৃষ্টি করে।

গবেষণায় জানা গেছে, যারা ধূমপান করে তাদের অর্ধেকই ধূমপানজনিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে অকালে এবং ধুঁকে ধুকে মারা যায়। ধূমপানের ফলে যেসব প্রাণঘাতী রোগ বেশি হয় সেগুলো হচ্ছে স্ট্রোক (মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ), হার্ট অ্যাটাক (হৃদরোগ), ফুসফুস ক্যান্সারসহ শরীরের বিভিন্ন অংশে ক্যান্সার, ফুসফুসে দীর্ঘমেয়াদি রোগ ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ (সিওপিডি, তন্মধ্যে রয়েছে এমফাইসিমা, ক্রনিক ব্রংকাইটিস), শ্বাসনালীর দীর্ঘমেয়াদি রোগ (যেমন, হাঁপানি), বার্জাস ডিজিস ইত্যাদি।

গবেষণায় জানা গেছে, ধূমপান করলে যেসব রোগ হয়ে থাকে দীর্ঘদিন পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হলে অধূমপায়ীদেরও অনুরূপ প্রাণঘাতী রোগ ও অকালমৃত্যু হতে পারে। ধূমপায়ীগণ ধোঁয়ার সামান্য অংশ নিজেরা গ্রহণ করেন, ধোঁয়ার বড় অংশই বাইরে ছাড়েন। এজন্য বাসা, অফিস, বিভিন্ন পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে কেউ ধূমপান করলে বিড়ি-সিগারেটের ধোঁয়ায় অধূমপায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হন। বিশেষ করে, নারী ও শিশু বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন। কারণ শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম। তাই পরোক্ষ ধূমপানের ফলে শিশুদের মধ্যে শ্বাসকষ্ট, হাঁপানিসহ সিওপিডিতে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। গবেষণায়ও বিষয়টি প্রমাণ পাওয়া গেছে। এজন্য বাসা, অফিস, বিভিন্ন পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনকে শতভাগ ধূমপানমুক্ত রাখা জরুরি।

পরোক্ষ ধূমপানের শিকার নারী মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। বিশেষ করে, নারী সন্তান ধারণ প্রক্রিয়ার ক্ষতি করে এবং গর্ভজাত সন্তানেরও ক্ষতি করে। গর্ভবতী নারী যদি পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হয়, তাহলে অকাল গর্ভপাত, কম ওজনের শিশুর জন্মদান বা মৃত সন্তান প্রসবের ঝুঁকি দেখা দেয়। এতে গর্ভজাত শিশুর জিনগত সমস্যাও দেখা দেয়। নবজাতকের হঠাৎ মৃত্যুর মতো ঘটনাও ঘটতে পারে।

ইউএস সার্জন জেনারেলের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৬-এ বলা হয়েছে, পরোক্ষ ধূমপানের কারণে হৃদরোগ, ফুসফুস ক্যান্সার, ফুসফুসের দীর্ঘমেয়াদি রোগসহ অনেক রোগ হয়ে থাকে। টোব্যাকো কন্ট্রোল জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষেত্রে কোনো নিরাপদ অবস্থা নেই। একমাত্র সম্পূর্ণ ধূমপানমুক্ত পরিবেশই অধূমপায়ীদের পরোক্ষ ধূমপানের কবল থেকে রক্ষা করতে পারে। ধূমপানমুক্ত পরিবেশ অধূমপায়ীদের পরোক্ষ ধূমপান থেকে সুরক্ষা প্রদান করে। এছাড়া ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণায় বলা হয়েছে, ধূমপানমুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা হলে ধূমপায়ীদের ধূমপান ত্যাগে সহায়ক পরিবেশ গড়ে তোলে।

২০১৮ সালে বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো, আমেরিকান ক্যান্সার সোসাইটি ও যুক্তরাজ্যের ক্যান্সার রিসার্চ-এর যৌথ গবেষণায় বলা হয়েছে, পরোক্ষ ধূমপানের কারণে বাংলাদেশে প্রায় ২৬ হাজার মানুষ প্রতিবছর মৃত্যুবরণ করে, যাদের অধিকাংশ শিশু। বাংলাদেশে শুধু পরোক্ষ ধূমপানের কারণে প্রত্যক্ষ ব্যয় (স্বাস্থ্যসেবায় ব্যক্তিগত ও সরকারি ব্যয়) এবং পরোক্ষ ব্যয় (অসুস্থতা/অক্ষমতা ও অকাল মৃত্যুর কারণে উৎপাদনশীলতার ক্ষতি) ৪ হাজার ১৩০ কোটি টাকা। এতে আরও বলা হয়েছে, ১৫ বছরের কমবয়সী শিশুর মধ্যে ৪ লাখ ৩৫ হাজারের বেশি শিশু তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত। এদের প্রায় সকলেই পরোক্ষ ধূমপানের শিকার। তন্মধ্যে ৬১ হাজারের অধিক শিশু বাড়িতে পরোক্ষ ধূমপানের শিকার।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক ২০০৩ সালে গৃহীত আন্তর্জাতিক তামাক নিয়ন্ত্রণ চুক্তি ফ্রেমওয়ার্ক কনভেশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) আর্টিকেল ৮-এ পরোক্ষ ধূমপানের প্রভাব থেকে অধূমপায়ীদের রক্ষার কথা বলা হয়েছে। এফসিটিসিতে সকল অভ্যন্তরীণ/আচ্ছাদিত জনসমাগমস্থল (কর্মস্থল) সম্পূর্ণ ধূমপানমুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত কনফারেন্স অব পার্টিস (সিওপি) এফসিটিসির আর্টিকেল ৮ বাস্তবায়নে একটি বিস্তারিত গাইডলাইন গ্রহণ করে। এফসিটিসির চাহিদা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক আর্টিকেলসমূহ বাস্তবায়নে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক ২০০৮ সালে গৃহীত এমপাওয়ার (MPOWER) পলিসি প্যাকেজ নীতির চ-তে Protect people from tobacco smoke (পরোক্ষ ধূমপানের প্রভাব থেকে অধূমপায়ীদের সুরক্ষা প্রদান) এর উদ্দেশ্য হচ্ছে: 'রেস্টুরেন্টসহ আচ্ছাদিত সব জনসমাগমস্থল ও কর্মস্থলে সম্পূর্ণ ধূমপানমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা।'

অধূমপায়ীদের সুরক্ষায় বাংলাদেশে 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫' (২০১৩ সালে সংশোধিত) অনুযায়ী পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ধূমপান নিষিদ্ধ রয়েছে। এ আইনের ধারা ২(চ)। পাবলিক প্লেস ও ২(ছ)। পাবলিক পরিবহনের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে:

পাবলিক প্লেস অর্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি অফিস, আধা-সরকারি অফিস, স্বায়ত্তশাসিত অফিস ও বেসরকারি অফিস, গ্রন্থাগার, লিফট, আচ্ছাদিত কর্মক্ষেত্র (indoor work place), হাসপাতাল ও ক্লিনিক ভবন, আদালত ভবন, বিমানবন্দর ভবন, সমুদ্র বন্দর ভবন, নৌবন্দর ভবন, রেলওয়ে স্টেশন ভবন, বাস টার্মিনাল ভবন, প্রেক্ষাগৃহ, প্রদর্শনী কেন্দ্র, থিয়েটার হল, বিপণী ভবন, চতুর্দিকে দেয়াল দ্বারা আবদ্ধ রেস্টুরেন্ট, পাবলিক টয়লেট, শিশুপার্ক, মেলা বা পাবলিক পরিবহনে আরোহনের জন্য যাত্রীদের অপেক্ষার জন্য নির্দিষ্ট সারি, জনসাধারণ কর্তৃক সম্মিলিতভাবে ব্যবহার্য অন্য কোনো স্থান অথবা সরকার বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, সময় সময় ঘোষিত অন্য যে কোন বা সকল স্থান;

পাবলিক পরিবহন অর্থ মোটর গাড়ি, বাস, রেলগাড়ি, ট্রাম, জাহাজ, লঞ্চ, যান্ত্রিক সকল প্রকার জন-যানবাহন, উড়োজাহাজ এবং সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্দিষ্টকৃত বা ঘোষিত অন্য যে কোনো যান;

এছাড়া 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০১৫'-এর ৪। (১)নং বিধি অনুযায়ী নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে শতভাগ ধূমপানমুক্ত করা হয়েছে: (ক) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, (খ) গ্রন্থাগারের অভ্যন্তরে, (গ) হাসপাতাল ও ক্লিনিক ভবন, (ঘ) প্রেক্ষাগৃহের অভ্যন্তরে, (ঙ) প্রদর্শনী কেন্দ্রের অভ্যন্তরে, (চ) থিয়েটার হলের অভ্যন্তরে, (ছ) চতুর্দিকে দেয়াল দ্বারা আবদ্ধ এক কক্ষবিশিষ্ট রেস্টুরেন্ট, (জ) শিশুপার্ক, (ঝ) খেলাধুলা ও অনুশীলনের জন্য নির্ধারিত আচ্ছাদিত স্থান, (ঞ) এক কামরাবিশিষ্ট পাবলিক পরিবহন' ইত্যাদি (বিধি ৪);

ধারা-৪ এ পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ধূমপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং আইন অমান্য করে ধূমপান করলে অনধিক তিনশত টাকা অর্থদণ্ড ধার্য করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে:

(১) কোনো ব্যক্তি পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ধূমপান করতে পারিবেন না।
(২) কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি অনধিক তিনশত টাকা অর্থদণ্ড দণ্ডণীয় হইবেন এবং উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃপুনঃ একই ধরনের অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ হারে দণ্ডণীয় হইবেন।

২০১৩ সালে সংশোধিত 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫' ধারা-৮ এ পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহনে নো-স্মোকিং সাইনেজ প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে:

(১) ...প্রত্যেক পাবলিক প্লেসের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক উক্ত স্থানের এক বা একাধিক জায়গায় এবং পাবলিক পরিবহনের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক সংশ্লিষ্ট যানবাহনে 'ধূমপান হইতে বিরত থাকুন, ইহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ' সম্বলিত নোটিশ বাংলা এবং ইরেজি ভাষায় প্রদর্শন করিবার ব্যবস্থা করিবেন।
(২) কোনো পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহনের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি অনধিক এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডণীয় হইবেন এবং উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃপুনঃ একই ধরনের অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ হারে দণ্ডণীয় হইবেন।

'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০১৫'-এর ৮।(খ)- তে সতর্কবাণীর সাইজ, (গ)- তে সতর্কবাণী লেখা ও তলদেশের রং বর্ণনা এবং (ঘ)-তে নমুনা জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের ওয়েবসাইটে প্রদর্শনের কথা বলা হয়েছে।

বাংলাদেশে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫' (২০১৩ সালে সংশোধিত) প্রতিপালনে কোনো কোনো ধূমপায়ীদের শিথিলতা লক্ষণীয়। ধূমপান যেহেতু মারাত্মক ক্ষতিকর নেশা, তাই এ নেশার জন্য অনেকেই পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ধূমপান করেন। গবেষণায় দেখা গেছে, পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে অধূমপায়ীরা পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হচ্ছে। গ্লোবাল অ্যাডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে-২০১৭ অনুযায়ী, ৪৪ শতাংশ প্রাপ্তবয়সী বা ২ কোটি ৫০ লাখ মানুষ গণপরিবহনে, প্রাপ্তবয়সী চাকরিজীবীদের ৪২.৭ শতাংশ বা ৮১ লাখ মানুষ কর্মস্থলে এবং ৪ কোটি ৮ লাখ মানুষ বাসায়/গৃহ-অভ্যন্তরে পরোক্ষ ধূমপানের শিকার।

গ্লোবাল ইয়ুথ টোব্যাকো সার্ভে-২০১৩ অনুযায়ী, ৩১.১ শতাংশ শিশু বাসায়/গৃহ-অভ্যন্তরে পরোক্ষ ধূমপানের শিকার। এছাড়া ৬১.৩ শতাংশ ছেলে ও ৫৪.৮ শতাংশ মেয়ে বিভিন্ন আবদ্ধ পাবলিক প্লেসে/পরিবহনের ভেতরে (যেমন: বিদ্যালয়, দোকান, বিপণি বিতান, রেস্টুরেন্ট, সিনেমা হল, অফিস, বাস ও ট্রেন, ইত্যাদি) এবং ৫৯.১ শতাংশ ছেলে ও ৪৯.৪ শতাংশ মেয়ে বিভিন্ন উন্মুক্ত পাবলিক প্লেসে (যেমন: খেলার মাঠ, ফুটপাথ, ভবনের প্রবেশ দ্বার, পার্ক, বিচ, বাস স্টেশন ও রেল স্টেশন) পরোক্ষ ধূমপানের শিকার।

তামাক সেবন, ধূমপান ও পরোক্ষ ধূমপানের ভয়াবহ ক্ষতি হতে সুরক্ষায় 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫' ২০১৩ সালে সংশোধিত হয়েছে এবং বর্তমানে যুগোপযুগী করার লক্ষ্যে সংশোধনের কাজ চলমান রয়েছে। এক্ষেত্রে যেসব বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন, সেগুলো হলো:

- শিশু, নারীসহ অধূমপায়ীদের সুরক্ষায় সকল পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহন শতভাগ ধূমপানমুক্ত করা;
- শিশু-কিশোরদের তামাকের নেশার প্রলোভন থেকে সুরক্ষায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, খেলার মাঠ, পার্ক ও সকল গণপরিবহনে সিগারেটসহ তামাক পণ্য বিক্রি নিষিদ্ধ করা;
- যত্রতত্র তামাক বিক্রি বন্ধ করার পাশাপাশি তামাক বিক্রেতাদের তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন মেনে চলতে বাধ্য করার জন্য লাইসেন্সের আওতায় আনা এবং আইন অমান্য করলে লাইসেন্স বাতিল করার বিধান যুক্ত করা;
- অনলাইন, ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট, অ্যাপস-এর মাধ্যমে তামাক পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় এবং তামাকের বিক্রয়কেন্দ্রে ক্ষতিকর তামাক পণ্য প্রদর্শন ও প্রচারণা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা;
- তামাক পণ্যের মোড়কে ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবার্তা ৯০ শতাংশ করা এবং মোড়কে উৎপাদনের তারিখ যুক্ত করা;
- ই-সিগারেট ব্যবহার, বিক্রি, বিপণন, বাজারজাতকরণ, উৎপাদন নিষিদ্ধ করা;

এসব বিধান যুক্ত করে বিদ্যমান আইনটি দ্রুত সংশোধন করা গেলে এর সুফল পাবে দেশের জনগণ। আশা করি, সরকার শীঘ্রই আইনটি সংশোধন করবে। আইন সংশোধন

একটি চলমান বিষয়। তাই বিদ্যমান আইন বাস্তবায়নেও বিশেষ নজর দিতে হবে। সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অধীনস্ত দপ্তর/সংস্থার পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থা, নাগরিক সমাজ ও গণমাধ্যমের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। যেমন:

● আইনানুযায়ী, সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, বেসরকারি অফিসসহ সকল পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে নো স্মোকিং সাইনেজ প্রদর্শন করতে হবে। এ সাইনেজ থাকলে মানুষ সচেতন হবে। পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ধূমপান হতে বিরত থাকবে।

● শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিশু পার্ক, শিশুদের খেলাধুলার স্থান, হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান, ইত্যাদি আইন অনুযায়ী শতভাগ ধূমপানমুক্ত। এসব বিষয়ে প্রচারণা জোরদার করা হবে।

● বিদ্যমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী ১৮ বছরের চাইতে কম বয়সী কোনো ব্যক্তির নিকট বিড়ি-সিগারেটসহ তামাক পণ্য বিক্রি বা তাদের দ্বারা বিক্রি নিষিদ্ধ। শিশুদের তামাক সেবন থেকে দূরে রাখতে শিশুদের নিকট তামাক বিক্রি নিষিদ্ধ সংক্রান্ত ধারা বাস্তবায়নে বিষয়ে সকলের ভূমিকা রয়েছে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, শিক্ষক, অভিভাবক সবার ভূমিকা রয়েছে।

● তামাক পণ্যের প্রচারণা বন্ধে উপজেলা ও জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা প্রয়োজন। আইন লঙ্ঘনের দায়ে জরিমানা ও শাস্তি কার্যকর হলে আইন বাস্তবায়ন গতিশীল হবে।

নাগরিক হিসেবে আমাদেরও দায়িত্ব রয়েছে। যেসব পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ধূমপান হয় তা সংশ্লিষ্টদের জানানো প্রয়োজন। যেসব রেস্টুরেন্টে ধূমপানের স্থান রয়েছে, সেগুলো বর্জন করা উচিত। নিজেদের অফিস ও বাসাবাড়ি শতভাগ ধূমপানমুক্ত রাখতে হবে। বিশেষ করে, অফিসে নো-স্মোকিং সাইনেজ থাকা বাধ্যতামূলক।

সবার সক্রিয় সহযোগিতায় আমরা যদি বাসাবাড়ি, পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে শিশু, নারীসহ অধূমপায়ীদের পরোক্ষ ধূমপান থেকে সুরক্ষা প্রদান করতে পারি, তাহলে জনস্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। শিশু ও নারীদের অসুস্থ্যতা ও অকালমৃত্যুর ঝুঁকি কমে আসবে।

আসুন, সকলে তামাক নিয়ন্ত্রণে সক্রিয় হই। বাসাবাড়ি শতভাগ তামাকমুক্ত রাখি। পাশাপাশি কর্মস্থলসহ পাবলিক পরিবহন ও পাবলিক প্লেস ধূমপানমুক্ত রাখতে সচেষ্ট হই।

লেখক: সদস্য, জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম, কোষাধ্যক্ষ, পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন ও মডারেটর, স্টপ টোব্যাকো বাংলাদেশ।

সৈয়দা আহসানা জামান (এ্যানী)

❖ কেমন আছে বাংলাদেশের কন্যাশিশুরা?

৩০ সেপ্টেম্বর জাতীয় কন্যাশিশু দিবস। এবারের প্রতিপাদ্য: 'আমি কন্যাশিশু – স্বপ্নে গড়ি, সাহসে লড়ি, দেশের কল্যাণে কাজ করি'।

জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম-এর পক্ষ থেকে আমরা প্রতিবছর জাতীয় কন্যাশিশু দিবস উদ্‌যাপনের সময় জানুয়ারি থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত আমাদের কন্যাশিশুরা কেমন আছে, সেটা গণমাধ্যমের সহায়তায় জাতির সামনে উপস্থাপন করে থাকি। এবার ফোরাম এর সদস্য সংগঠন এডুকো বাংলাদেশের সহযোগিতায় প্রতিবছর দৈনিক পত্রিকা থেকে কন্যাশিশুদের সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থা, নিপীড়ন ও নির্যাতন, যৌন হয়রানি ও ধর্ষণ এবং খুন ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের তেরোটি (১৩) ক্যাটাগরির আওতায় ৫৬টি সাব ক্যাটাগরিতে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করেছি। একইসঙ্গে আমরা দেখার চেষ্টা করেছি কন্যাশিশুদের প্রতি এ সকল নির্যাতন ও সহিংসতার বিপরীতে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে কিনা। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে চাই, নির্যাতনের ক্ষেত্রে নির্যাতনের শিকার হওয়া কন্যাশিশু বা তার পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলেও, সে তুলনায় অভিযুক্তদের আটক হওয়া, শাস্তি পাওয়া বা ন্যায়বিচার পাওয়ার সংখ্যা নেই বললেই চলে। এ থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, বিচারহীনতার সংস্কৃতির জন্য নির্যাতন ও সহিংসতা দিন দিন ভয়ঙ্কর থেকে ভয়ঙ্করতম হচ্ছে এবং অপরাধীরা ক্রমাগত উৎসাহিত হচ্ছে অপরাধমূলক কার্যক্রম করতে। নিম্নে চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত কন্যাশিশু প্রতি সহিংসতার চিত্র তুলে ধরা হলো:

১. যৌন হয়রানি ও নির্যাতন: আমাদের কন্যাশিশু ও নারীরা পথে-ঘাটে, যানবাহনে, বাজারে, পাবলিক প্লেসে, এমনকি শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ বাসা বাড়িতে হরহামেশা যৌন নিপীড়নের শিকার হচ্ছে। মিডিয়া মনিটরিংয়ে আমরা দেখতে পেয়েছি ২০২৫ সালের প্রথম আট মাসে (জানুয়ারি-আগস্ট) মোট ৫৪ জন কন্যাশিশু যৌন হয়রানির শিকার, যা গতবছরের একই সময়ের তুলনায় দ্বিগুণের বেশি হলেও ২০২৩ সালের তুলনায় কম। উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের একই সময়ে ২৮ জন এবং ২০২৩ সালে ১১৭ জন কন্যাশিশু যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হয়েছিল। তবে মনে রাখতে হবে, ২০২৪ সালে নির্বাচন ও গণআন্দোলনের কারণে গণমাধ্যমের মূল ফোকাস ছিল সেদিকে,

কন্যাশিশু নির্যাতনের সংবাদ গণমাধ্যমে ২০২৪ সালে অনেক কম এসেছে বলে আমরা মনে করি। যদিও আমাদের কর্ম এলাকার চিত্র ছিল ভিন্ন।

২. ধর্ষণ: মানবাধিকার লঙ্ঘনের সব থেকে নিকৃষ্টতম রূপ হলো ধর্ষণ। বাংলাদেশে বিদ্যমান আইনে ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। তারপরও ধর্ষণ বেড়েই চলেছে। জানুয়ারি-আগস্ট ২০২৫ অর্থাৎ গত ৮ মাসে ৩৯০ জন কন্যাশিশু ধর্ষণ ও গণধর্ষণের শিকার, যা গত বছরের তুলনায় অনেক বেশি। তন্মধ্যে ৪৩ জন গণধর্ষণ এবং ২৯ জন প্রতিবন্ধী কন্যাশিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। ধর্ষণ/গণধর্ষণের পর ১৫ জন কন্যাশিশু খুন হয়েছে ও ৫ জন আত্মহত্যা করেছে। উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের প্রথম ৮ মাসে মোট ২২৪ জন এবং ২০২৩ সালে ৪৯৩ জন কন্যাশিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। এছাড়া, গত ৮ মাসে ১৩৪ জন কন্যাশিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছিল। ২০২৪ সালের একই সময়ে ৩২ জন কন্যাশিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা চালানো হয়েছে।

আমরা দেখতে পেয়েছি, ধর্ষণ ও গণধর্ষণের মতো জঘন্যতম অপরাধের শিকার হতে হচ্ছে চার মাস থেকে এক বছর বয়সের শিশুদেরকেও। এর অন্যতম প্রধান কারণ আইন বাস্তবায়নে শিথিলতা। সম্প্রতি দৈনিক সমকালে প্রকাশিত প্রতিবেদনে দেখা যায়, পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিআইবি) ২০১৬ হতে ২০২৩ সাল সময়কালে সংগঠিত ৮৪টি আলোচিত ধর্ষণ মামলার ভিকটিম ও ধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিদ্বয়সহ বাদী, বিবাদীদের সাক্ষাৎকারভিত্তিক তথ্যে দেখা যায়, ধর্ষণের মামলায় অভিযুক্তদের ২০.২৩ শতাংশ মাদকাসক্ত, ২৭.৩৮ শতাংশ পর্নোগ্রাফিতে আসক্ত। ভুক্তভোগীদের ৭২.৬১ শতাংশ শিশু ও ছাত্রী। অনেক ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তি ভুক্তভোগীর আত্মীয় ও পরিচিত। অধিকাংশ ভুক্তভোগী অতিদরিদ্র।

পিআইবি'র তথ্যের সঙ্গে আমাদের মনিটরিংয়ের তথ্যের মিল পাওয়া যায়। আমরা লক্ষ করেছি, বেশকিছু ধর্ষণের ঘটনা নিকটাত্মীয় ও পরিচিতদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। ধর্ষণের শিকার কন্যাশিশুরা সারাজীবন একটা ট্রমার মধ্যে থেকে বেড়ে ওঠে, নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে অপারগ হয়; যার কুফল পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের ওপরও পড়ে। তবে মনে রাখতে হবে, এ ধরনের সহিংসতার বিপরিতে খুব কম সংখ্যক ভুক্তিভোগীই সমাজের ভয়ে আইনের আশ্রয় গ্রহণ করে না।

৩. অপহরণ ও পাচার: পত্রিকার তথ্যানুযায়ী এই সময়ে অপহরণ ও পাচারের শিকার হয়েছে ৩৪ জন কন্যাশিশু, তন্মধ্যে অপহরণের শিকার ১৮ জন কন্যাশিশুকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। গত বছর একই সময়ে ১৯ জন এর শিকার হয়েছিল।

৪. গৃহশ্রমিক নির্যাতন: সংগৃহীত তথ্য থেকে আমরা গৃহশ্রমিক নির্যাতনের মোট ১টি তথ্য পেয়েছি, যা গতবছরের চাইতে অনেক কম। গতবছর একই সময়ে ১০ জনের নির্যাতনের শিকার হয়েছিল। তবে এটা মনে রাখতে হবে, এ ধরনের নির্যাতনের তথ্য সাধারণত গণমাধ্যমে আসে না।

৫. আত্মহত্যা: কন্যাশিশুরাই শুধু নয়, কোনো একজন শিশু আত্মহত্যার পথ বেছে নিবে, এটি মোটেও কাম্য নয়। এর মাধ্যমে পরিবার, সমাজ এমনকি রাষ্ট্রের ওপরও দায়ভার এসে পড়ে। জানুয়ারি-আগস্ট ২০২৫ সময়কালে ১০৪ জন কন্যাশিশু আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছেন, যা গত বছরের চাইতে কম। তন্মধ্যে অন্যদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে ৩২ জন, পরিবারে মা-বাবা বা অভিভাবকের মতের সঙ্গে অমিল হওয়ার কারণে ২৬ জন, পারিবারিক কলহের কারণে ২১ জন, প্রেমের সম্পর্কের প্রভাবে ৯ জন এবং অজানা কারণে ১২ জন আত্মহত্যা করেছেন। এছাড়া, পারিবারিক সহিংসতা, যৌতুকের জন্য নির্যাতন, স্বামী/স্বামীর পরিবারের সদস্যদের নির্যাতন এবং পরিবার/শিক্ষক/সহপাঠী/অন্যান্যদের উপহাসের কারণে ১ জন করে মোট ৪ জন আত্মহত্যা করেছেন। উল্লেখ্য, গত বছর প্রথম ৮ মাসে ১৩৩ জন কন্যাশিশু আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিলেন।

৬. হত্যা: জানুয়ারি-আগস্ট ২০২৫ দেখেছে যে, ওই ৮ মাসে ৮৩ জন কন্যাশিশু খুন হয়েছে, যা গত বছরের চাইতে কিছুটা বেশি। তন্মধ্যে ধর্ষণের পর ১৫ জন, যৌতুকের জন্য ৪ জন, অন্যান্য কারণে পারিবারিক নির্যাতনে ৩১ জন, পূর্ব শত্রুতার কারণে ৯ জন ও প্রেমের সম্পর্কের কারণে ৫ জন খুন হয়েছেন। এছাড়া ১৯ জন কন্যাশিশুর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যায়নি। মনে রাখা দরকার, এসব সংবাদপত্র থেকে সংগৃহীত তথ্য। আমরা ধারণা করি, এর বাইরে আরও কন্যাশিশু খুন হয়েছেন যেগুলো নির্বাচিত গণমাধ্যমগুলোতে আসেনি। উল্লেখ্য, গতবছর প্রথম ৮ মাসে ৮১ জন কন্যাশিশুকে হত্যা করা হয়েছিলেন।

৭. রহস্যজনক মৃত্যু: তথ্য মোতাবেক, ৫০ জন কন্যাশিশুর রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে, যা গত বছরের একই সময়ের চাইতে আড়াই গুণ বেশি। কিন্তু কেন মৃত্যু হয়েছে এ সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো কারণ বা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের জানুয়ারি-আগস্ট সময়কালে ২০ জন কন্যাশিশুর রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে, যাদের মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যায়নি।

৮. পানিতে ডুবে মৃত্যু: প্রতিবছরই কন্যাশিশুদের একটি বড় অংশ পানিতে পড়ে মৃত্যুবরণ করে। এটি মোটেই কাম্য নয়। জানুয়ারি থেকে আগস্ট ২০২৫– এই আটমাসে ২০৫ জন কন্যাশিশু পানিতে ডুবে মারা যান, যা গত বছরের চাইতে বেশি। গত বছর একই সময়ে ১৮৭ জন কন্যাশিশুর পানিতে পড়ে মৃত্যুবরণের তথ্য পাওয়া গেছে। মূলত, এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাটিও সমাজের কন্যাশিশুদের প্রতি অবহেলার দিক-নির্দেশনা প্রদান করে অনেকাংশে।

৯. পারিবারিক সহিংসতা: আমরা দেখতে পেয়েছি, গত ৮ মাসে ১৯ জন কন্যাশিশু নিজগৃহে ও স্বামীগৃহে পারিবারিক সহিংসতার শিকার। বাংলাদেশে যৌতুক আইনগতভাবে নিষিদ্ধ হলেও এর প্রকোপ এখনও সমাজে বিদ্যমান। যেমন, গত ৮ মাসে ৪ জন কন্যাশিশু যৌতুকের জন্য খুন হয়েছেন এবং ১ জন যৌতুকের জন্য নির্যাতন সইতে না পেরে আত্মহত্যা করেছেন।

১০. বাল্যবিবাহ: এখানে একটা বিষয় স্পষ্ট যে, দেশে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ বলবৎ থাকলেও তা পুরোপুরি কার্যকর নয়। জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম ও সদস্য সংগঠন, স্থানীয় প্রশাসন ও গণমাধ্যমের সহায়তায় বিগত ৮ মাসে সাতজন কন্যাশিশু বাল্যবিবাহের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের জনশুমারি ও গৃহগণনা প্রতিবেদন ২০২৩ এর তথ্য তুলে ধরা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। এতে অল্পবয়সীদের বিয়ে, তালাক ও স্বামী/স্ত্রী মারা যাওয়ার তথ্য উঠে এসেছে। এতে দেখা যায়, ১০ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিশুদের ১.৬৬% বিবাহিত [ছেলেশিশু ০.৯৬% এবং কন্যাশিশু ২.৪২%] এবং ১৫ থেকে ১৯ বছর শিশুদের ২১.২৪% বিবাহিত [ছেলেশিশু ৪.৪২% এবং কন্যাশিশু ৩৭.২১%]। এতে দেখা যায়, নারীর বিয়ের গড় বয়স ১৯.২৯ বছর হলেও এ বয়সের আগেই ৩৭% এর বেশি কন্যাশিশুর বিয়ে হয়ে যায়। অর্থাৎ, দেশে কন্যাশিশুরা বাল্যবিবাহের শিকার হচ্ছে এবং সরকার বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে যে আইন করেছে সেটি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে না।

১১. সাইবার বুলিং: বাংলাদেশের জনশুমারি ও গৃহগণনা প্রতিবেদন ২০২৩ অনুযায়ী, ১৫-বছর ও তদূর্ধ্বদের প্রায় ৭০% মোবাইল ও ৩৭% ইন্টারনেট ব্যবহার করে। এ প্রযুক্তি ব্যবহারে গোপন ভিডিও ধারণ করে ছড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে জিম্মি করে বিভিন্ন অনৈতিক সুবিধা আদায়ের ঘটনা জানা যায়। এতে নারী-পুরুষ উভয়ে ক্ষতির স্বীকার হলেও কন্যাশিশু ও নারীর প্রতি এর প্রভাব বেশি পড়ে।

সাম্প্রতিক সময়ে অনলাইনে সাইবার বুলিং মারাত্মকভাবে বেড়ে গেছে। ফেক বা বট আইডি'র মাধ্যমে কন্যাশিশুসহ নারী শিক্ষার্থী, নারী রাজনীতিবিদ ও বিভিন্ন পেশার নারীদের বুলিং করা হচ্ছে। এ বিষয়ে এখনো বিস্তারিত গবেষণার তথ্য না থাকলেও সাইবার স্পেসে নারীকে হেয় করা হচ্ছে, অশালীনভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে, কাটছাট করে ছবি ও ভিডিও করা হচ্ছে, পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদা নষ্ট করা হচ্ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ফেক বা বট আইডির মাধ্যমে এসব অপকর্ম করা হয়।

পরিবারে কন্যাশিশু ও নারীর প্রতি বিনিয়োগ কম হয়, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় কন্যাশিশুর চাইতে ছেলেশিশুর চাহিদা গুরুত্ব পায়। এর প্রধান কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, বাবা-মাকে বৃদ্ধ বয়সে ছেলেশিশু 'দেখভাল' করবে। ছেলের জন্য ব্যয়কে বিনিয়োগ হিসেবে ধরা হয়। অন্যদিকে, কন্যাশিশু বিয়ে হয়ে অন্য পরিবারে চলে যাবে, কন্যাশিশুর জন্য ব্যয়কে খরচ বা অপব্যয় হিসেবে দেখা হয়। এ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে শিশু বয়স থেকেই কন্যাশিশুরা বিভিন্নভাবে বঞ্চিত হয়। দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবারে এ সমস্যা প্রকট। সেসব পরিবারে কন্যাশিশুদের মধ্যে অপুষ্টির হারও বেশি। কন্যাশিশুরা বিনোদনের পর্যাপ্ত সুযোগ পায় না। স্কুল থেকে ফিরে ছেলে শিশু খেলাধুলা করার সুযোগ পেলেও কন্যাশিশুকে গৃহস্থালি কাজ করতে হয়। এটা কন্যাশিশুর জন্য এক ধরনের প্রশিক্ষণও, কারণ বড় হয়ে অন্যের পরিবারে সে যেন গৃহস্থালি কাজ করতে পারে। যেন স্বামীগৃহে 'বাবা-মা কিছুই শেখায়নি'– এমন অপবাদ সইতে না হয়।

যেসব দরিদ্র পরিবারে মা-কে বাইরে কাজ করতে হয় সেসব পরিবারে বাধ্যতামূলকভাবে কন্যাশিশুদের গৃহস্থালি কাজ সামলাতে হয়। আর যে পরিবারে কন্যাশিশু থাকে না, সে পরিবারের যাবতীয় গৃহস্থালি কাজ নারীকেই করতে হয়। সমাজে গৃহস্থালি কাজে পুরুষের অংশগ্রহণ আশানুরূপ নয়। গৃহস্থালি কাজে নারীদের ভূমিকা মুখ্য হলেও এসব কাজ পরিবার-সমাজ ও রাষ্ট্রে মূল্যায়ন হয় না।

সর্বশেষ জাতীয় জনশুমারির তথ্য অনুযায়ী, কারিগরি শিক্ষায় পুরুষের (৭৩.৫৭%) তুলনায় নারীর (২৬.৪৩%) অংশগ্রহণ খুবই কম। এজন্য পুরুষের পাশাপাশি নারীদেরও কারিগরি শিক্ষায় দক্ষতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এর প্রভাব কর্মসংস্থানে লক্ষ করা যায়। ১৫ বছর ও তদূর্ধ্ব জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৭২.৭৫% পুরুষের বিপরীতে ১২.৮৮% নারী কাজে যুক্ত। তবে গৃহস্থালি কাজে পুরুষের (৫.১৩%) চাইতে অনেক বেশি নারী (৯৪.১৬%) যুক্ত।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং কারিগরি শিক্ষায় নারীদের নিরাপদ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। গবেষণায় তাদের উদ্বুদ্ধ ও সহায়ক পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। মনে রাখতে হবে, একজন কন্যাশিশু সুশিক্ষিত হলে তার যেমন উন্নতি হবে, তেমনি পরিবার ও রাষ্ট্রেও তার ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

পরিবর্তিত ও সম্ভাবনাময় বাংলাদেশে আমাদের প্রত্যাশা ও দাবিসমূহ:

১. যৌন হয়রানি, উত্ত্যক্তকরণ ও নিপীড়ন রোধে সর্বস্তরের জন্য 'যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও সুরক্ষা অধ্যাদেশ ২০২৫' অনুমোদন করা;

২. শিশু নির্যাতন, ধর্ষণ ও হত্যার সকল ঘটনাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে দ্রুততম সময়ের মধ্যে বিচারিক কার্যক্রম সম্পন্ন করা;

৩. ধর্ষণের ঘটনার অভিযোগ আসলে ধর্ষণের শিকার নারী ও কন্যার পরিবর্তে অভিযুক্ত ব্যক্তিকেই প্রমাণ করতে হবে যে, সে এ ঘটনা ঘটায়নি, এ সম্পর্কিত প্রচলিত আইনের বিধান সংশোধন করা;

৪. মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী বাধ্যতামূলকভাবে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যৌন নিপীড়নবিরোধী সেল গঠনের কঠোর নির্দেশনা মনিটরিংয়ের ভিত্তিতে নিশ্চিত করা, যাতে যৌন নিপীড়নের যেকোনো ঘটনার বিচার করা যায়। এ সংক্রান্ত জোরালো নির্দেশনা প্রতিটি অফিস-আদালতেও প্রণয়ন করা, যাতে একজন নারী বা কন্যাশিশু কোনোভাবেই যেন তার সহকর্মী, শিক্ষক বা বন্ধু কারও দ্বারা নিপীড়নের শিকার না হন;

৫. কন্যাশিশু নির্যাতনকারীদের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক আশ্রয়-প্রশ্রয় দেওয়া বন্ধ করা;

৬. শিশু সুরক্ষায় শিশুদের জন্য একটি পৃথক অধিদপ্তর গঠন করা;

৭. বাল্যবিবাহ বন্ধে প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নজরদারি বৃদ্ধির পাশাপাশি সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা কার্যক্রম বৃদ্ধি করা;

৮. বর্তমানে বেশিরভাগ শিশুই স্মার্টফোনের মতো ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করে।

তাই প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং প্রযুক্তির নেতিবাচক দিক থেকে তাদেরকে রক্ষার জন্য উচ্চ পর্যায়ের আইসিটি বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতায় সব ধরনের পর্নোগ্রাফিক সাইট বন্ধ করা;

৯. সাইবার বুলিংয়ের বিরুদ্ধে আইনের কঠোর প্রয়োগ বাস্তবায়ন করা, ফেক বা বট আইডি নিষিদ্ধ ও বন্ধ করা, সাইবার বুলিংয়ের এ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা, একজন কন্যাশিশুও যাতে পর্নোগ্রাফির শিকার না হয় তা নিশ্চিত করা;

১০. সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর বাজেট বৃদ্ধি করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কন্যাশিশু ও তাদের অভিভাবকদের এর আওতায় আনা;

১১. ক্রমবর্ধমান কন্যাশিশু ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধে নারী-পুরুষ, সরকার, প্রশাসন, নাগরিক সমাজ, মিডিয়া, পরিবার সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং পাশাপাশি তরুণ ও যুবসমাজকে সচেতনকরণ সাপেক্ষে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তাদেরকে যুক্ত করা;

১২. নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে উল্লেখিত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া;

১৩. দেশের সকল রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহারে কন্যাশিশু-সহ সকল শিশু ও নারীদের বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিয়ে নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়ন করা।

শেষ কথা

কন্যাশিশুদের ছেলেশিশুর মতোই দৃপ্ত, দৃঢ় ও সাহসী করে গড়ে তুলতে হবে, যাতে কন্যাশিশুরা অশুভ শক্তির প্রতিবন্ধকতা ডিঙিয়ে এগোতে পারে। সেজন্য কন্যাশিশু তথা নারীর অগ্রগতি মানেই পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রেরও উন্নতি। মনে রাখতে হবে, জনশুমারি-২০২৩ অনুযায়ী, দেশে অর্ধেকের বেশি কন্যাশিশু ও নারী। তারা যদি দেশের কল্যাণে কাজ করে, তাহলে এটি জুলাই পরবর্তী নতুন বাংলাদেশ গঠনের নিয়ামক হয়ে ওঠতে পারে।

বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরামের জোরালো দাবি হলো, রাষ্ট্র সংস্কারের মধ্য দিয়ে অবশ্যই নারীবান্ধব পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে, যাতে একজন নারী বা কন্যাশিশু যেকোনো সময়ে কোনো ধরনের সহিংসতার ভয় ছাড়াই ঘর-বাসা থেকে বের হতে পারেন এবং নির্বিঘ্নে পথ চলতে পারেন। একইসঙ্গে কর্মক্ষেত্রে নারীবান্ধব পরিবেশ তৈরি করতে হবে।

লেখক: ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেটর, জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম।

গ্লোরিয়াস গ্রেগরী দাস

❖ কন্যাশিশুর কান্না

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ, যেখানে শিশুদের একটি বড় অংশ কন্যাশিশু। তাদের সঠিক বিকাশ জাতির অগ্রগতির জন্য অপরিহার্য। কিন্তু কন্যাশিশুরা বেড়ে ওঠার পথে নানা সমস্যার মুখে পড়ে, যা তাদের স্বপ্ন ও সম্ভাবনাকে বাধাগ্রস্ত করে।

আমার একটি ব্যক্তিগত স্বপ্ন, বাংলাদেশে সকল শিশু একদিন একটি ভাষায় কথা বলবে, যার নাম হবে 'হাসি'। আমরা শিশুদের জীবনে অনেক হাসির অভাব দেখি। তাদের অনেকের কাছ থেকে শুনেছি, জীবনে কখনও হাসেনি। সেই শিশুদের জীবনের এই অভাব দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। আর যদি শিশুটি কন্যা হয়, তাহলে তো কথাই নেই, তাদের জীবন যেন শুধুই কান্নার। আমার মেয়ের জন্মের খবরে সমাজ ও হাসপাতালের লোকজন যতটা খুশি হয়েছিল, তার চেয়ে অনেকগুণ বেশি খুশি হতে দেখেছি আমার ছেলের জন্মের সময়। ছেলে হলে আমাকে অনেক জনকে বকশিশ দিতে হয়েছিল। আমি প্রতিবাদ করতে চেয়েছিলাম– 'আপনারা কি কোনো মেয়ের জন্মের সময় এভাবে তাকে বরণ করেন? আমার মেয়েকে তো তা করেননি!' এই প্রশ্ন এখন আমাদের সবার কাছে রাখতে চাই। আমাদের দৃষ্টিকোণে আমরা কি কোথাও কন্যাশিশুকে বঞ্চিত বা অবাঞ্ছিত করছি? তাদের জন্ম থেকেই কি তাদেরকে আলাদা করছি?

আমার মেডিকেলে পড়ার সময় জেনেছিলাম, হাসপাতালে ছেলেশিশুদের ধনুষ্টঙ্কার রোগ বেশি হয়। কারণ জানতে গিয়ে বুঝলাম, যেহেতু কন্যাশিশুদের এই চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে আনা হয় না, তাই ওদের রেকর্ড কম। মেয়েশিশুর মৃত্যু পিতামাতার মনে যেন খুব একটা দাগ কাটে না। কতটা ভয়ঙ্কর চিন্তা! এটাও কি কারণ হতে পারে?

আমাদের দেশে ৫১ শতাংশ বিবাহই শিশুবিবাহ। এই হার মূলত মেয়েদের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ মেয়েরাই বাল্যবিবাহের শিকার হয় বেশি। ছেলেদের ক্ষেত্রে এ ধরনের উচ্চ হারের পরিসংখ্যান নেই। তবে কিছু তথ্য বলছে, ছেলেদেরও কখনও কখনও বয়স কমে বিয়ে হয়, কিন্তু মেয়েদের তুলনায় অনেক কম। আরও কিছু ভয়াবহ তথ্য দেখা যায়। প্রথমত, বাল্যবিবাহ কন্যাশিশুদের জন্য একটি বড় সমস্যা। ইউনিসেফের তথ্যমতে, বাংলাদেশের

প্রায় ৫১ শতাংশ মেয়ের বিয়ে হয় ১৮ বছরের আগেই, আর প্রায় ১৫ শতাংশ মেয়ের বিয়ে হয় ১৫ বছরের আগেই। এর ফলে তারা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয় এবং অকাল মাতৃত্বের স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়ে। আমি অবাক হই– ১৫ বছর বয়সে একটি শিশু কি শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কগুলো বুঝতে পারে? একটি শিশু কীভাবে আরেকটি শিশু কিংবা শ্বশুরবাড়ির বড়দের দায়িত্ব নিতে পারে? আমরা যেন আমাদের শিশুদের শিশুকাল নষ্ট না করি; তাদেরকে তা উপভোগ করতে দিই।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষার অভাব কন্যাশিশুদের পিছিয়ে দেয়। মাধ্যমিক স্তরে মেয়েদের স্কুল ছাড়ার হার এখনও প্রায় ৪০ শতাংশ। তৃতীয়ত, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংকট বড় চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশে কিশোরী মেয়েদের প্রায় ৪০ শতাশ অপুষ্টিতে ভোগে, আর রক্তস্বল্পতায় আক্রান্ত প্রায় ৩৬ শতাংশ। চতুর্থত, লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য পরিবার ও সমাজে মেয়েদেরকে ছেলে সন্তানের তুলনায় পিছিয়ে রাখে। এছাড়া নিরাপত্তাহীনতা ও যৌন হয়রানি অনেক কন্যাশিশুকে শিক্ষার পরিবেশ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

আমরা এমন এক সমাজে বাস করি, যেখানে নারীদের সম্মান করাই কঠিন সেখানে নারী শিশুর মর্যাদা দেওয়া বলাই বাহুল্য। প্রায় প্রতিদিনই খবরের কাগজে দেখি শিশু ধর্ষণের ঘটনা। এমনকি চার বছরের শিশুকেও ধর্ষণের শিকার হতে হয় যে কিনা এসবের কিছুই বোঝে না। এই নিষ্পাপ প্রাণের আর্তনাদ আমাদের কানে বাজে না। আমরা কেন জানি অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছি দিনের পর দিন। আইনের শাসন যেন মুচকি হাসে, কারণ এটা তো শুধু আমাদের দেশের উঁচু শ্রেণির মানুষদের উপভোগ্য। আইনের শাসন যেন সমাজের এই শ্রেণিবিন্যাস ভেদ করতে পারে না। আমাদের জাতীয় সংস্কার প্রয়োজন শ্রেণিকরণভিত্তিক আইনের শাসন, অনৈতিক জীবনাচরণ এবং ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে।

আসুন, আমরা যদি শিশুদের হাসাতে না-ই পারি, অন্তত যেন তাদের না কাঁদাই। আমার বিশ্বাস, তাদের কান্নায় আমাদের সৃষ্টিকর্তাও কাঁদেন। আমাদের পৃথিবীটা যেন নারী-পুরুষ নির্বিশেষে শিশুদের মত নিষ্পাপ ও আনন্দময় হয়– এই প্রার্থনা করি সবসময়। এ হোক আমাদের সকলের অঙ্গীকার।

লেখক: ন্যাশনাল ডিরেক্টর, কম্প্যাশন ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ।

ড. আলেয়া পারভীন

❖ বেশ্যা, নারী কুশপুত্তলিকা ও নতুন বাংলাদেশ

সম্প্রতি নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে তাদের প্রতিবেদন দাখিল করেছে। কমিশনের প্রতিবেদনের বেশ কিছু ধারার প্রতিবাদে একটি দল ৩ মে ২০২৫ তারিখে রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বিশাল সমাবেশ করেছে। দলটি প্রতিবেদনের কিছু ধারা আপত্তিসহ পুরো নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনই বাতিল চেয়েছে। একটি গণতান্ত্রিক দেশে প্রতিবাদ সমাবেশ অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু প্রতিবাদী সমাবেশে নারী সম্পর্কে যে অকথ্য ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে তা অত্যন্ত অপমানজনক এবং গর্হিত অপরাধ। কারণ এই সমাবেশে নারীকে সরাসরি বেশ্যা বলে অভিহিত করা হয়েছে। ২০২৪ এর গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী নতুন বাংলাদেশে এই প্রথমবারের মতো নারী 'বেশ্যা' উপাধি পেলো!

নারী বেশ্যা মানে মা-স্ত্রী-কন্যা-বোন সকলেই বেশ্যা। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে নারীকে বেশ্যা বানায় কারা? অবশ্যই পুরুষ। পুরুষেরা যদি বেশ্যা বাড়িতে না যান, তাহলে তো নারীর বেশ্যা হওয়ার কথা নয়। পুরুষেরা ভালো হয়ে গেলে তো অভিধানে 'বেশ্যা' শব্দটাই আর থাকে না। কাজেই নারীকে বেশ্যা বলে গালি দিয়ে পুরুষেরা কেবল মায়ের জাতিকেই চরম অপমান ও অপরাধ করেননি বরং এই সত্য প্রমাণ করলেন যে তারা নিজেরাও বেশ্যাবৃত্তির অপর অংশ।

একই দিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের সামনে দেখা গেছে গলায় রশি ঝোলানো কালো কাপড় দিয়ে চোখ-মুখ ঢাকা এবং হাত-পা বাধা বেগুনি শাড়ি পরিহিতা একটি নারী কুশপুত্তুলিকাকে জুতা-পেটা করতে। জুতাপেটা করতে করতে এক পর্যায়ে কুশপুত্তলিকার শাড়ি টেনে খুলে ফেলা হচ্ছে এবং এই কাজ করেছে টুপি-পাঞ্জাবি পড়া তথাকথিত ধার্মিক ব্যক্তিরা। নারীর প্রতি চরম ঘৃণা আর ক্ষোভের যেন বহিঃপ্রকাশ ঘটালো শাড়ি টেনে খুলে ফেলার মধ্যে দিয়ে। নারীর প্রতি চরম অবমাননার এই দৃশ্য দেখে মনে হচ্ছে নিজের মাকেই যেন আমরা বিবস্ত্র করেছি, উলঙ্গ করেছি বিশ্ববাসীর সামনে।

নারী কুশপুত্তলিকাটিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় নারীর চোখ ও মুখ কালো কাপড় দিয়ে বাঁধা। যার অর্থ হলো নারীরা যেন কোনো কিছু দেখতে না পায় এবং বলতে না পারে। নারীর হাত বাধার অর্থ নারী যেন কাজ করতে না পারে। আর নারীর পা বাঁধার অর্থ নারী যেন ঘর থেকেই বের হতে না পারে। নারীকে জুতা পেটার অর্থ নারীকে যে কোনো সময় সে কেনোভাবে যে কোনো শ্রেণির পুরুষ ঘরে কিংবা বাইরে নির্যাতন করতে পারে। কী ভয়ঙ্কর মানসিকতা! এই দৃশ্যই যেন প্রমাণ করছে নারীকে কোন দৃষ্টিতে দেখেন সমাজের এক শ্রেণির পুরুষ? নারীর প্রতি কী পরিমাণ বিদ্বেষ লুকিয়ে রয়েছে তাদের অন্তরে, যা তাদের আচরণেই প্রকাশ পেলো! নারীকে কীভাবে ঘৃণা করতে হবে, হেনস্থা করতে হবে, নির্যাতন করতে হবে তাই যেন শেখানো হচ্ছে জুতাপেটা করার মাধ্যমে। অথচ কোরআন বারংবার ওইসব ব্যক্তিকে তিরস্কার করেছে যারা নারীদের পুরুষদের তুলনায় নিকৃষ্ট মনে করে। ইসলাম চিরকালই নারীদের সম্মান করার জন্য নির্দেশ দিয়েছে, সদয় আচরণের তাগিদ দিয়েছে।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর অনেকেই মনে করেছিলেন যে নারীরা এখন পূর্বের তুলনায় স্বাধীনতা ভোগ করবেন। কোটা ও বৈষম্যমুক্ত সমাজে পুরুষের ন্যায় সমানাধিকার ভোগ করবে। জুলাই গণঅভ্যুত্থান নারীদের ব্যাপক অংশগ্রহণে সফল হলেও বাস্তবে নারীর অবস্থা যে কী হতে পারে আগামীতে সম্ভবত তারই একটি নমুনা দেখা গেল নারীকে 'বেশ্যা' বলা ও 'জুতাপেটা' করার মাধ্যমে। ইতোমধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে পাবলিক প্লেসে নারীকে পেটানো শুরু হয়ে গেছে। নতুন বাংলাদেশে এক শ্রেণির লোক গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে মাইকিং করে বেড়াচ্ছেন যাতে নারীরা বাইরে না যান, ঘরেই অবস্থান করেন। এমতাবস্থায় নারীকেই নতুন করে ভাবতে হবে নারী বৈষম্যমুক্ত সমাজের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলবেন নাকি বৈষম্যযুক্ত ও সমতাহীন সমাজের পরাধীন নাগরিক হিসেবে সমাজে বসবাস করবেন।

প্রতিটি মানুষের সে নারী হোক কিংবা পুরুষ হোক মনের ভাব প্রকাশের অধিকার সকলেরই আছে, তা বক্তৃতার মাধ্যমে হোক কিংবা লেখার মাধ্যমেই হোক। ভুল হোক কিংবা সঠিক হোক। সঠিক হলে গ্রহণযোগ্য হবে, আর ভুল হলে সংশোধন করা হবে, যা স্বাভাবিক বিষয়। কিন্তু নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনের আপত্তিকৃত ধারাসমূহ সংশোধনের দাবি না করে পুরো নারী সংস্কার কমিশনই বাতিল করতে হবে–এমন দাবী অগ্রহণযোগ্য। অপ্রয়োজনীয় সংস্কারগুলোকে পাশ কাটিয়ে প্রয়োজনীয় সংস্কারগুলোর মধ্য দিয়ে নারীর অধিকার ও সম্মান এবং দেশের ধর্মীয় ও কালচারাল মূল্যবোধ যেন অক্ষুণ্ন থাকে সে লক্ষ্যেই কাজ করতে হবে। তাছাড়া নারীর বক্তব্য বা অভিযোগ প্রকাশের অধিকার কেবল ইসলামের ইতিহাসেই স্বীকৃত নয়, পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন সূরাতেও রয়েছে এর স্বীকৃতি। সূরা আল-মুজাদালায় নারীদের মুক্তচিন্তা ও বক্তব্যসহ পুরুষের সঙ্গে যুক্তি-তর্কে আলোচনায় অংশগ্রহণের কথা বলা

হয়েছে। ইতিহাসে এমন অনেক নজির রয়েছে যেখানে খলিফাদের বিরুদ্ধে মুসলিম নারীরা সোচ্চার ছিলেন এবং যুদ্ধ ও আইন প্রণয়নের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন।

নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে ভালো-মন্দ যাই প্রকাশ পাক না কেন প্রতিবাদকারীরা গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে বা সংবাদ সম্মেলন করে তাদের মতামত কমিশনকে জানাতে পারতেন। বিশেষজ্ঞ দ্বারা নতুন কমিশন পুনর্গঠনের প্রস্তাব করতে পারতেন। কিন্তু তা না করে যেভাবে নারীকে বেশ্যা বলে কটূক্তি করে এবং নারীর কুশপুত্তলিকাকে উলঙ্গ করেছে তাতে নারীর প্রতি প্রতিবাদকারীদের বিদ্বেষ ও ন্যাক্কারজনক চিন্তাধারারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বলা যায়। কারণ নারী শিক্ষিত হলে পুরুষের সহযোগী হবেন সমান তালে। ফলে তাকে অন্যায়ভাবে দাবিয়ে রাখা যাবে না। স্বল্পশিক্ষিত নারী হলে তাকে নির্ভরশীল, অধস্তন বা অধিকারহীন করে রাখা সহজ হয়। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষিত নারীকে এক শ্রেণির পুরুষেরা ভয় পায়। আজ থেকে ১০০ বছর আগে বেগম রোকেয়া তৎকালীন সমাজে নারী-পুরুষের অবস্থান সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, 'স্বামী যখন পৃথিবী হইতে সূর্য ও নক্ষত্রের দূরত্ব মাপেন, স্ত্রী তখন একটা বালিশের ওয়ারের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ সেলাই করিবার জন্য মাপেন।' ১০০ বছর পরও নারীকে সেই একই অবস্থানে দেখতে চান তারা। অথচ মুসলিম নারীরা পৃথিবীব্যাপী কত যে সাহসিকতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে চলেছেন প্রতিনিয়ত তা অনেকেই জানেন কিন্তু মানতে চান না।

পৃথিবীতে নারীদের অবদান অসীম। সেজন্যই নারীরা শান্তিতে নোবেল পুরস্কারও লাভ করেছেন। যেমন, ইরানের শিরিন এবাদি, ইয়েমেনের তাওয়াক্কুল কারমান, পাকিস্তানের মালালা ইউসুফজাই। নারীরা কেবল ভূমিতেই নয়, মহাকাশ অভিযানেও একের পর এক বিপ্লব ঘটিয়ে চলেছেন। ইরানের আনুশেহ্ আনসারী, আরব আমিরাতের সারাহ বিনতে ইউসুফ আল আমিরী এবং নূরে আল মাক্রুসি, আমেরিকার আয়েশা বোয়ে, পাকিস্তানের নামিরা সেলিম, সৌদি আরবের রায়ানাহ বার্ণাবি সকলেই পুরুষের পাশাপাশি সমভাবে এগিয়ে চলছে। এই এগিয়ে চলা তো মানব কল্যাণের লক্ষ্যে। তাই সময় এসেছে নতুন বাংলাদেশে নারীরা কী চান? সকল ধরনের বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে সামনে এগিয়ে যাবেন নাকি বেগম রোকেয়ার সময়ে কিংবা আইয়ামে জাহেলিয়ার যুগে পুনরায় ফিরে যাবেন?

লেখক: সহযোগী অধ্যাপক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), সরকারি সংগীত কলেজ, ঢাকা।

ড. তানিয়া হক

❖ কন্যাকে কন্যাশিশু নয়, মানুষ হিসেবে মূল্যায়ন করতে হবে

আগামী ১১ই অক্টোবর বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস পালিত হবে। এ উপলক্ষে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে এবং বেসরকারি সংস্থাগুলোও বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করেছে। বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস পালনের গুরুত্ব বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। এই দিনে বিশ্বব্যাপী কন্যাশিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দাবি উত্থাপন করা হয়। ২০১১ সালের ১৯ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে সর্বসম্মতভাবে আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরবর্তী বছর, অর্থাৎ ২০১২ সালের ১১ই অক্টোবর তারিখকে 'আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সেই থেকে প্রতি বছর ১১ অক্টোবর আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে। মূলত কন্যাশিশুর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণ এবং তাদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস পালন করা হয়। বাংলাদেশও সেই সময় থেকে প্রতিবছর রাষ্ট্রীয়ভাবে আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস উদ্‌যাপন করে আসছে। উল্লেখ্য, এই দিবসের লক্ষ্য কেবল বছরে একদিন কন্যাশিশুদের অধিকার নিয়ে আলোচনা নয়; বরং পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নারীদের প্রতি প্রচলিত বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের প্রয়াসই এর মূল উদ্দেশ্য। আজকের কন্যাশিশুরাই ভবিষ্যতে সমাজ, অর্থনীতি এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে এবং দায়িত্ব পালন করবে। সুতরাং তাদের শৈশবকাল থেকেই যথাযথভাবে প্রস্তুত করা অপরিহার্য; অন্যথায় ভবিষ্যতে তারা অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে সক্ষম হবে না। আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস পালনের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো শিশুদের সঠিকভাবে বিকশিত করে তোলা, যাতে তারা দেশের উন্নয়নে কার্যকর অবদান রাখতে পারে। একটি মানুষের জন্য শৈশবকাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই সময়েই ব্যক্তির চিন্তা, সৃজনশীলতা এবং মূল্যবোধ বিকশিত হয়। অতএব শিশুকালকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই নারী এবং শিশুদের মধ্যে কন্যাশিশুর হারও

প্রায় ৫০ শতাংশ। এই বিপুল জনগোষ্ঠীকে উপেক্ষা করে কখনোই সুষম ও টেকসই জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই নারী এবং কন্যাশিশুদের প্রতি পারিবারিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি আরও উদার ও ইতিবাচক হওয়া আবশ্যক। প্রশ্ন জাগে, কন্যাশিশু বলতে কাদের বোঝানো হয়? বাংলাদেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী ১৮ বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত যে কোনো ব্যক্তিকে শিশু হিসেবে গণ্য করা হয়। সে অনুসারে, কোনো নারীর বয়স ১৮ বছর পূর্ণ না হলে তাকে কন্যাশিশু বলা হয়। রাষ্ট্রীয়ভাবে শিশুরা নানা ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা প্রাপ্তির অধিকারী, ফলে নারী শিশুরাও সমানভাবে সেই অধিকার পাওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে কন্যাশিশুদের প্রতি সামাজিক ও পারিবারিক দৃষ্টিভঙ্গি এখনো পর্যাপ্ত উদার নয়। সামাজিক বাস্তবতায় কন্যাশিশুকে প্রায়শই 'দ্বিতীয় শ্রেণির' নাগরিক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পরিবারেও তারা নানাভাবে অবহেলিত হয় এবং ছেলেশিশুর তুলনায় কম গুরুত্ব পায়। অভিভাবকরা সাধারণত মনে করেন, ছেলেশিশুরা বড় হয়ে সংসারের দায়িত্ব পালন করবে, আর কন্যাশিশুরা বিবাহিত হয়ে শ্বশুরবাড়িতে চলে যাবে এবং গৃহস্থালি কাজ করবে। ফলে ছেলেশিশুর শিক্ষায় ও বিকাশে বেশি বিনিয়োগ করা হয়। কিন্তু একবারও বিবেচনা করা হয় না যে, শিক্ষিত কন্যাশিশুও পরিবারের দায়িত্ব পালনে সক্ষম। সমাজ, পরিবার ও রাষ্ট্রের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে কন্যাশিশুরা অবহেলিত। যদিও শিক্ষিত ও সচেতন পরিবারগুলোতে কন্যাশিশুদের গুরুত্ব বাড়ছে, তবুও সার্বিক চিত্রে দেখা যায় যে তারা এখনও ছেলেশিশুদের সমপরিমাণ গুরুত্ব পায় না। আমরা নারীর ক্ষমতায়নের কথা বলি, কিন্তু একটি মেয়েকে প্রকৃত অর্থে কীভাবে ক্ষমতায়িত করা যায় সে বিষয়ে সঠিক ধারণার অভাব রয়েছে। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে কন্যাশিশুর আত্মপ্রতিষ্ঠাই প্রকৃত নারীর ক্ষমতায়নের পথ। নারীর ক্ষমতায়ন কারো অনুগ্রহ নয়; এটি নারীর অর্জনযোগ্য অধিকার, যা শিক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব। উপযুক্ত শিক্ষা ছাড়া তারা সমাজে নিজেদের অবস্থান সুসংহত করতে পারবে না। তাদের এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে তারা স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে এবং সমান সুযোগ পায়। এছাড়া কন্যাশিশুদের প্রতি বৈষম্য কেবল স্বল্পোন্নত দেশেই সীমাবদ্ধ নয়; উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশগুলোতেও বিভিন্ন রূপে তা বিদ্যমান। পৃথিবীতে এমন দেশ খুব কমই আছে যেখানে ছেলে শিশু ও কন্যাশিশুকে সমানভাবে দেখা হয়।

নারী শিক্ষার অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধক হলো পারিবারিক ও সামাজিক সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি। আইন অনুযায়ী শিশু বলতে ১৮ বছরের কম বয়সী ছেলে ও মেয়েকে বোঝালেও সামাজিক বাস্তবে ছেলে ও মেয়েদের অভিজ্ঞতায় পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ছেলেরা সাধারণত প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার ঝরে পড়ার শিকার হয়, আর মেয়েরা বেশি ঝরে পড়ে মাধ্যমিক স্তরে। এর অন্যতম কারণ হলো দারিদ্র্যপীড়িত পরিবারগুলোর অভিভাবকরা মনে করেন, ছেলেদের পড়াশোনার মাধ্যমে কর্মসংস্থান নিশ্চিত নয়; তাই তাদের অল্প বয়সে শ্রমে নিযুক্ত করা হলে পরিবারে অর্থনৈতিক সহায়তা হবে। অপরদিকে, কন্যাশিশুর ক্ষেত্রে ঝরে পড়ার প্রধান কারণ হলো অভিভাবকদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ

এবং সামাজিক কলঙ্কের ভয়। অনেক ক্ষেত্রে কন্যাশিশুর অমতেই তার বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়। যদিও আইনে ১৮ বছরের আগে বিয়ে দেওয়া নিষিদ্ধ, তবুও গ্রামীণ অঞ্চলে বয়স বাড়িয়ে বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

বাল্যবিবাহ কন্যাশিশুর জন্য মারাত্মক অভিশাপস্বরূপ, যা তার জীবনের সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দেয়। কন্যাশিশুকে তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলাই প্রকৃত অর্থে নারী অধিকার সুরক্ষার প্রথম পদক্ষেপ। এর জন্য শিক্ষার বিকল্প নেই। কন্যাশিশুরা সমাজে নানাভাবে বৈষম্য ও নির্যাতনের শিকার হয়। ছেলেশিশুদের তুলনায় তারা অনেক বেশি সীমাবদ্ধতায় বেড়ে ওঠে। গ্রামীণ অঞ্চলে এই বৈষম্য বিশেষভাবে প্রকট। পরিবারে ছেলের শিক্ষায় ব্যয়কে ভবিষ্যতের বিনিয়োগ হিসেবে দেখা হলেও মেয়ের শিক্ষায় ব্যয়কে প্রায়শই অপ্রয়োজনীয় ব্যয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

এটি অনস্বীকার্য যে বাংলাদেশের শিশুরা, বিশেষত কন্যাশিশুরা, বহুমাত্রিক অবহেলা ও নিপীড়নের শিকার হচ্ছে। সমাজে শিশুশ্রমের ব্যাপক উপস্থিতি আজও দৃশ্যমান, বিশেষত দরিদ্র পরিবারের শিশুরা কঠোর পরিশ্রমসাপেক্ষ শ্রমে নিয়োজিত থাকে। এরা প্রায়ই ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হয় এবং সামান্য ভুলের জন্য শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়। ছেলেশিশুরা প্রধানত কলকারখানায় কায়িক শ্রমে যুক্ত থাকে, অপরদিকে কন্যাশিশুরা গার্মেন্টস শিল্পে এবং গৃহস্থালি শ্রমে নিয়োজিত থাকে, যেখানে তাদের মজুরি অত্যন্ত কম এবং সামান্য ত্রুটিতেই সহিংসতা বা শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়। গৃহকর্মে নিয়োজিত কন্যাশিশুরা বিশেষভাবে শারীরিক ও যৌন নির্যাতনের ঝুঁকিতে থাকে।

পথশিশুরা সমাজে নানাভাবে বঞ্চনা ও সহিংসতার শিকার হয় এবং প্রায়ই এক শ্রেণির বিকৃত মানসিকতার মানুষের দ্বারা যৌন সহিংসতার মুখোমুখি হয়। দেশে প্রতিবন্ধী শিশুর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হলেও প্রতিবন্ধী কন্যাশিশুরা সামাজিক অবহেলা ও বৈষম্যের শিকার আরও বেশি মাত্রায়। যৌনকর্মীদের সন্তানদের প্রতিও সমাজে উপেক্ষা স্পষ্ট এবং তাদের মৌলিক অধিকার প্রায়শই অগ্রাহ্য করা হয়। সামাজিক কাঠামো এখনো এমন যে, কোনো কন্যাশিশু যৌন বা শারীরিক সহিংসতার শিকার হলে দোষারোপ করা হয় ভুক্তভোগীকেই। এর ফলে তার বিবাহের সম্ভাবনা ক্ষুণ্ন হয়, তাকে সমাজে অচ্ছুত হিসেবে বিবেচনা করা হয়, অথচ অপরাধীকে সামাজিক বা আইনি জবাবদিহির আওতায় আনা হয় না।

এছাড়া জাতিগত সংখ্যালঘু ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কন্যাশিশুরা দ্বিগুণ বঞ্চনার শিকার। তারা একদিকে দরিদ্রতা ও ভৌগোলিক প্রান্তিকতার কারণে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও সামাজিক সুরক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়; অন্যদিকে তাদের জাতিগত পরিচয়ের কারণে মূলধারার সমাজে বৈষম্য ও বর্ণবাদী মনোভাবের মুখোমুখি হতে হয়। পাহাড়ি অঞ্চল বা সীমান্তবর্তী এলাকায় বসবাসরত কন্যাশিশুরা প্রায়ই অকালবিবাহ, অপুষ্টি এবং মানব পাচারের ঝুঁকিতে থাকে। ফলে তাদের শৈশবের অভিজ্ঞতা আরও জটিল ও অনিরাপদ হয়ে ওঠে।

শিশুকালে সংঘটিত যৌন সহিংসতা বা শারীরিক নির্যাতনের মতো অনাকাঙ্ক্ষিত অভিজ্ঞতা, যার জন্য ভুক্তভোগী কোনোভাবেই দায়ী নয়, তার পরবর্তী জীবনে গভীর মানসিক আঘাত ও সামাজিক বঞ্চনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের সামাজিক বাস্তবতা এমন যে, অন্যায়ের শিকার হওয়া সত্ত্বেও কন্যাশিশুকেই সামাজিক দায়ভার বহন করতে হয়। যেখানে ছেলেশিশুকে পরিবারের সম্পদ হিসেবে দেখা হয়, সেখানে কন্যাশিশুকে প্রায়ই পারিবারিক বোঝা হিসেবে গণ্য করা হয়। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র কোনো স্তরেই কন্যাশিশুর মর্যাদা, অধিকার ও চাহিদাকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা হয় না, ফলে তাদের সম্ভাবনা সীমাবদ্ধ থেকে যায়।

কন্যাশিশুরা কোনো একরৈখিক বা অভিন্ন গোষ্ঠী নয়। তাদের বহুবিধ ঝুঁকি ও বঞ্চনার পরিস্থিতি চিহ্নিত করা জরুরি। এখনই সময় সিদ্ধান্ত নেওয়ার– আমরা কি তাদের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব গড়ে তুলব, নাকি সমাজের বোঝা হিসেবে দেখতে থাকব। অতএব, কন্যাশিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় সর্বপ্রথম পরিবারকে সচেতন হতে হবে। ছেলে ও মেয়েশিশুর মধ্যে কোনো পার্থক্য করা যাবে না। যথাযথ শিক্ষা ও সহায়ক পরিবেশ প্রদান করলে কন্যাশিশুরাও পরিবার ও সমাজের সম্পদে পরিণত হতে পারে। বাংলাদেশের নারীরা কর্মক্ষেত্রের প্রতিটি খাতে তাদের সক্ষমতা প্রমাণ করেছে। তাই শৈশবকাল থেকেই কন্যাশিশুকে যথাযথ শিক্ষা ও সহায়ক পরিবেশ দিতে হবে। তাদের জন্য খেলাধুলা ও বিনোদনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে, যাতে তারা অন্যান্য শিশুদের মতো বিকশিত হতে পারে। কোনো অবস্থাতেই ছেলে ও মেয়েশিশুর মধ্যে বৈষম্য রাখা যাবে না।

ছেলে ও মেয়েশিশু হলো একই বৃক্ষের দুটি ফুল বা একই দেহের দুটি বাহু। একটির অভাবে অন্যটি অসম্পূর্ণ। তাই পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই ইতিবাচক হতে হবে। এবারের আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবসে আমাদের অঙ্গীকার হোক: কন্যাশিশুদের প্রতি আর কোনো বৈষম্য নয়। ছেলে ও মেয়েশিশুদের সমান গুরুত্ব প্রদান করে তাদেরকে সমান সুযোগে গড়ে তোলা হবে। আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমরা কি কন্যাশিশুকে ভবিষ্যতের নেতা হিসেবে দেখতে চাই, না কি তাকে বোঝা হিসেবে বিবেচনা করতে চাই? এখনই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপযুক্ত সময়।

লেখক: অধ্যাপক, উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ড. বদিউল আলম মজুমদার

❖ সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্বের কোন পদ্ধতি যথাযথ

এক.

আফ্রিকার তুলনায় দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশ অর্থনৈতিকভাবে অধিক উন্নত হলেও পুষ্টির দিক থেকে আমরা অনেক পিছিয়ে। নব্বইয়ের দশকে ইউনিসেফ পরিচালিত অনকেগুলো গবেষণা দক্ষিণ এশিয়ায় নারীর সর্বক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত অধস্তন অবস্থাকেই এর জন্য দায়ী করেছে। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, অপুষ্ট নারীর গর্ভজাত সন্তান অপুষ্টিতে ভোগে, যা পুরো জাতির শারীরিক ও মানসিক শক্তির বিকাশে বড় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। নারী শিক্ষিত হলে, সন্তান শিক্ষিত হয় এবং জাতি শিক্ষিত হয়। নারী উপার্জনক্ষম হলে এবং উপার্জন করলে, সে উপার্জন মূলত পরিবারের কল্যাণে ব্যয় হয়।

এছাড়াও মানবজীবনে অপুষ্টির অভাব ভয়াবহ। উদাহরণস্বরূপ, যেসব ভ্রূণ মাতৃগর্ভে অপুষ্টিতে ভোগে, জন্মের পর পরিণত বয়সে তারা বেশি হারে হৃদ্‌রোগ ও ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয়, যার কারণ বিশেষজ্ঞদের ভাষায় 'ফিটাল প্রোগ্রামিং'। 'ফিটাল প্রোগ্রামিং'-এর প্রভাবে বাংলাদেশে হৃদরোগ ও ডায়াবেটিসের হার পশ্চিমা দেশগুলোর তুলনায় অনেক বেশি। যদিও এগুলো 'ডিজিজেস অব দ্য অ্যাফ্লুয়েন্স' বা প্রাচুর্যেরই ব্যাধি।

এসব কারণে নারীর অপুষ্টি, যার উৎস নারীর প্রতি বঞ্চনা, অবহেলা এবং তাঁদের অধস্তন অবস্থা আমাদের পুরো জাতিকে পিছিয়ে রাখছে। তাই এ অবস্থান থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে রাজনীতিসহ সব ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বঞ্চনার অবসান ঘটানো জরুরি।

দুই.

আমাদের জনগোষ্ঠীর অর্ধেকের বেশি নারী, কিন্তু জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বসহ সমাজের প্রায় সব ক্ষেত্রে তাঁরা অনেক পিছিয়ে আছেন। রাজনীতি ও সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রে নারীর পশ্চাৎপদতা নিরসনের লক্ষ্যে আমাদের বিদ্যমান সংবিধানের ১৯(৩) অনুচ্ছেদে 'জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে নারীদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা'র অঙ্গীকার করা হয়েছে।

সাংবিধানিক এ অঙ্গীকারকে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে আমাদের সংবিধানে বর্তমানে ৫০টি

আসন নারীদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে, যেগুলো সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী দলগুলোর মধ্যে তাদের আসনের হারের ভিত্তিতে বিতরণ করা হয়।

বিদ্যমান সংরক্ষণপদ্ধতির অনেকগুলো সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যার অন্যতম হলো নারীর জন্য সংরক্ষিত আসনগুলো মূলত আলংকারিক। এগুলোয় কোনো নির্বাচনই হয় না, তাই এসব আসন পূরণ করতে কোনো যোগ্যতারও প্রয়োজন হয় না।

বস্তুত এসব আসন অনুগ্রহ বা ফায়দা হিসেবে দলগুলো ব্যবহার করে থাকে। তাই সংরক্ষিত আসনে নারীদের দায়বদ্ধতা মূলত দলের কর্তাব্যক্তিদের কাছে থাকে। ফলে এর মাধ্যমে নারী নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে না। এ ছাড়া এসব আসনে ভয়াবহ মনোনয়ন-বাণিজ্যের অভিযোগ রয়েছে।

তিন.

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পটভূমিতে রাষ্ট্র মেরামতের যে আকাঙ্ক্ষা জনমনে জাগ্রত হয়েছে, তাতে সংসদে বিদ্যমান সংরক্ষিত আসনব্যবস্থাকে বাদ দিয়ে একে নতুন করে ঢেলে সাজানোর এক অভূতপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এমন পটভূমিতে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের পক্ষ থেকে ৩০টি রাজনৈতিক দলগুলোর বিবেচনার জন্য ছয়টি বিকল্প প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। প্রথম প্রস্তাবটি এসেছে সংবিধান সংস্কার কমিশনের পক্ষ থেকে। দ্বিতীয় প্রস্তাবটি এসেছে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সুপারিশ থেকে।

টেবিল: বিকল্প পদ্ধতিতে ১০০ সংরক্ষিত আসন বিতরণের বিশ্লেষণ

	নারী প্রতিনিধিত্ব	দ্বৈত প্রতিনিধিত্ব	সরাসরি নির্বাচন	জনগণের কাছে দায়বদ্ধতা	অন্তর্ভুক্তিমূলক না আলংকারিক	নতুন নেতৃত্বের ক্ষমতায়ন	যোগ্যতা বা সম্পর্ক	ফায়দা প্রদানের হাতিয়ার (মনোনয়ন বাণিজ্যের সুযোগ)
সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব (তিন সাধারণ আসন নিয়ে এক সংরক্ষিত আসন)	৪০০ জনের মধ্যে ১০০ জন (২৫%)	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	বহুলাংশে আলংকারিক	কিছুটা	যোগ্যতা	অস্পষ্ট
নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব (১০০ আসনে ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে সরাসরি নির্বাচন)	৪০০ জনের মধ্যে ১০০ জন (২৫%)	না	হ্যাঁ	হ্যাঁ	অন্তর্ভুক্তিমূলক	হ্যাঁ	যোগ্যতা	না
জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলের প্রাপ্ত ভোটের আনুপাতিক হারে (পিআর পদ্ধতি)	৪০০ জনের মধ্যে ১০০ (২৫% নারী)	না	না	না	না	না	সম্পর্ক	হ্যাঁ
জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলের প্রাপ্ত আসনের হারে (বিদ্যমান পদ্ধতি)	৪০০ জনের মধ্যে ১০০ (২৫% নারী)	হ্যাঁ	না	না	সম্পূর্ণভাবে আলংকারিক	না	সম্পর্ক	হ্যাঁ

চার.

উপরিউক্ত প্রস্তাবগুলো কয়েকটি সুস্পষ্ট মানদণ্ডের ভিত্তিতে বিশ্লেষণের চিত্র সংযুক্ত টেবিলে প্রদর্শন করা হয়েছে। মানদণ্ডগুলো হলো: নারীর প্রতিনিধিত্বের হার, প্রস্তাবিত সংরক্ষণ পদ্ধতিতে দ্বৈত প্রতিনিধিত্ব সৃষ্টি হবে কিনা, সরাসরি নির্বাচন হবে কিনা, জনগণের কাছে দায়বদ্ধতা সৃষ্টি হবে কিনা, পদ্ধতি কি আলংকারিক কিনা, এর মাধ্যমে নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টি হবে কিনা, এটি কি যোগ্যতা না সম্পর্ক নির্ভর এবং এটি কি মূলত ফায়দা প্রদানের হাতিয়ার। বিশ্লেষণ থেকে এটি সুস্পষ্ট যে ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিই নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য সর্বাধিক কার্যকর ব্যবস্থা।

এই পদ্ধতিতে সংসদের আসনসংখ্যা ৪০০-তে উন্নীত করে লটারি বা অনুরূপ পদ্ধতিতে প্রথম মেয়াদে ১০০টি আসন, দ্বিতীয় মেয়াদে অন্য ১০০টি আসন, তৃতীয় মেয়াদে অন্য আরও ১০০টি আসন এবং চতুর্থ মেয়াদে অবশিষ্ট ১০০টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে এবং প্রতি মেয়াদে বাকি ৩০০ আসন নারী-পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। এতে দ্বৈত প্রতিনিধিত্ব সৃষ্টি হবে না। এটি ফায়দা প্রদানের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। এতে সরাসরি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং নির্বাচিত প্রার্থীরা সাধারণ আসন থেকে নির্বাচিত প্রার্থীদের মতো সমসুযোগ, দায়িত্ব ও ক্ষমতা উপভোগ করবেন এবং দলীয় প্রধানদের পরিবর্তে জনগণের কাছে দায়বদ্ধ হবেন।

এতে যোগ্য নারীরা পাঁচ বছরের মেয়াদকালে নিজ যোগ্যতায় 'কনস্টিটিউয়েন্সি' গড়ে তুলতে পারবেন এবং পরবর্তী সময় সাধারণ আসন থেকে পুরুষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জিতে আসতে পারবেন। ফলে ২০ বছরের ব্যবধানে নারীর জন্য আসন সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তাই ফুরিয়ে যেতে পারে। কারণ এই পদ্ধতিতে ভবিষ্যতে সারা দেশে একঝাঁক নারী নেতৃত্ব গড়ে উঠবে।

উদাহরণস্বরূপ, ঘূর্ণায়মান পদ্ধতি ব্যবহারের কারণে ভারতের পঞ্চায়েতে নারী প্রতিনিধির সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বেড়েছে। যেমন, ভারতীয় পঞ্চায়েতের তিন স্তরে–গ্রাম, মধ্য (পঞ্চায়েত সমিতি) এবং জেলায় মোট নারী সদস্যের সংখ্যা ২০০২ সালে প্রায় ৫ লাখ ৮৬ হাজার থেকে ২০০৮ সালে প্রায় ১০ লাখ ৪০ হাজারে এসে দাঁড়িয়েছে। একই সময়ে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েতে নারী প্রতিনিধির সংখ্যা বেড়েছে ১৩ হাজার ৩০০ থেকে ২১ হাজার ৩৫১ জনে। এমনই পটভূমিতে ভারত সরকার লোকসভা ও বিধানসভায় ঘূর্ণায়মান পদ্ধতি প্রবর্তনের জন্য ২০২৩ সালে একটি আইন পাস করেছে। উল্লেখ্য, পঞ্চায়েত পর্যায়ে নারী নেতৃত্ব বিকাশে ঘূর্ণায়মান পদ্ধতির সফলতার বিবেচনায় এটি লোকসভা ও রাজ্যসভায় ১৫ বছরের জন্য প্রবর্তনের লক্ষ্যে ভারত সরকার ২০২৩ সালে একটি আইন প্রণয়ন করে।

পাঁচ.

নারীসমাজ ও সচেতন নাগরিকেরা বহুদিন থেকেই নারীদের জন্য নির্দিষ্ট আসন থেকে সরাসরি নির্বাচনের দাবি করে আসছেন এবং রাজনৈতিক দলগুলোও এই দাবির প্রতি সমর্থন জুগিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ২০০১ সালের অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে প্রকাশিত নির্বাচনী ইশতেহারে বিএনপি সুস্পষ্টভাবে অঙ্গীকার করে: 'সংসদে নারীদের আরও কার্যকরী ভূমিকা পালন ও ক্ষমতায়নের জন্য তাঁদের আসনসংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে এবং নারী আসনে সরাসরি নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।'

একইভাবে অন্যান্য দলও সংসদে নারীদের জন্য সরাসরি নির্বাচনের অঙ্গীকার করে আসছে। সরাসরি নির্বাচনের পক্ষে ব্যাপক জনমতও রয়েছে। নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের পক্ষ থেকে দেশব্যাপী প্রায় ৪৬ ব্যক্তির মধ্যে পরিচালিত এক জরিপে ৭৩ দশমিক ৮৮ শতাংশ উত্তরদাতা জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনসংখ্যা ১০০টি করে, সেগুলো থেকে যোগ্যতার ভিত্তিতে নারীদের সরাসরি নির্বাচনের পক্ষে মত দিয়েছেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, জুলাই জাতীয় সনদে যে কয়টি অপূর্ণতা রয়ে গেছে তার মধ্যে অন্যতম হলো ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে সংসদে নারীদের জন্য আসন সংরক্ষণের বিষয়ে ঐকমত্যের অর্জনে অপারগতা। রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের দ্বিতীয় দফার ২৩ দিনের আলোচনায় জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব ১০০ (একশত) আসনে উন্নীত করার লক্ষ্যে দলগুলো একমত হয়েছে। কিন্তু পাঁচ পাঁচবার আলোচনার পরও সংসদে নারী প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে একটি সন্তোষজনক সমঝোতায় পৌঁছা সম্ভবপর হয়নি। বস্তুত রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ঐকমত্য কমিশনের আলোচনায় রাজনীতিতে নারীর ন্যায্য অধিকার পরাজিত হয়েছে এবং জয়ী হয়েছে পুরুষতন্ত্র। কারণ ১০০ আসনে নারীদের সরাসরি নির্বাচনের ব্যাপারে জনমত থাকলেও রাজনৈতিক দলগুলো পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি। বরং বিদ্যমান আলংকারিক ৫০টি সংরক্ষিত আসনের বিধান বহাল রয়েছে এবং সংরক্ষিত আসনে নারীদের সরাসরি নির্বাচনের অপূর্ণই থেকে গিয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের নারী সমাজের প্রতিনিধিরাও যথাসময়ে এব্যাপারে প্রয়োজনীয় অ্যাক্টিভিজম প্রদর্শন করতে পারেনি।

দীর্ঘ আলোচনায় শেষ পর্যন্ত সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে যে ঐকমত্য হয়েছে তা হলো: (ক) বিদ্যমান সংরক্ষিত ৫০টি আসন বহাল রেখে সংবিধানের ৬৫(৩) অনুচ্ছেদে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হবে; (খ) জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ স্বাক্ষরের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে বিদ্যমান ৩০০ সংসদীয় আসনের জন্য প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৫% (পাঁচ) শতাংশ নারী প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়ার জন্য দলগুলোকে আহ্বান জানানো হবে; (গ) পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলো নূন্যতম ৫% (পাঁচ) শতাংশ নারী প্রার্থী

মনোনয়ন দিবে; (ঘ) এই পদ্ধতিতে রাজনৈতিক দলগুলো সাধারণ নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে নূন্যতম ৩৩ শতাংশ নারী প্রার্থী মনোনয়নের লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনে নূন্যতম ৫ শতাংশ বর্ধিত হারে নারী প্রার্থী মনোনয়ন অব্যাহত রাখবে; (ঙ) সংবিধানে বর্ণিত জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন অব্যাহত রেখে সংবিধানের সপ্তদশ (১৭তম) সংশোধনী (যা ৮ জুলাই ২০১৮ সালে সংসদে পাশ হয়) এর মাধ্যমে সংরক্ষিত নারী আসনের মেয়াদ ২৫ বছর বৃদ্ধি করা হয়, হিসাব অনুযায়ী তা ২০৪৩ সাল পর্যন্ত বহাল থাকবে; তবে সাধারণ নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রার্থী মনোয়নের ক্ষেত্রে তেত্রিশ (৩৩%) শতাংশ নারী প্রার্থিতার লক্ষ্য ২০৪৩ সালের আগেই যদি অর্জিত হয়ে যায়, তাহলে সংবিধানের সপ্তদশ (১৭তম) সংশোধনীর মাধ্যমে প্রবর্তিত বিধান নির্ধারিত সময়ের আগেই বাতিল হয়ে যাবে।

লেখক: সদস্য, জাতীয় ঐকমত্য কমিশন ও সম্পাদক সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক

ডা. হালিদা হানুম আখতার

❖ বাংলাদেশে বাল্যবিবাহঃ একটি বিশ্লেষণ

ভূমিকা

বাল্যবিবাহ বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যা, যা দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আলোচনার বিষয়। ১৮ বছরের নিচে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া – যা বাল্যবিবাহ নামে পরিচিত – মেয়েদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, তাদের সম্ভাবনা সীমিত করে এবং গুরুতর স্বাস্থ্য ও সামাজিক ঝুঁকির মুখে ফেলে। বাংলাদেশে বিশ্বের সর্বোচ্চ বাল্যবিবাহের হারগুলোর একটি বিদ্যমান, যেখানে প্রায় অর্ধেক মেয়েকে ১৮ বছরের আগে বিয়ে দেওয়া হয়। এর কারণ, পরিণতি ও সমাধানগুলো বোঝা দেশের কন্যাশিশুদের জন্য একটি নিরাপদ ও ন্যায্য ভবিষ্যৎ গড়তে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বে শিশুদের অধিকার এবং লিঙ্গ সমতার আলোকে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু।

বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের স্থায়িত্ব গভীর সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক কারণে নিহিত। দরিদ্রতা সবচেয়ে বড় কারণ। দরিদ্র পরিবারগুলো অনেক সময় মেয়েকে অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে আর্থিক বোঝা কমানোর চেষ্টা করে। এছাড়া, কন্যাদায় প্রথাও সমস্যাকে তীব্র করে তোলে, কারণ কম বয়সী কনের জন্য সাধারণত কম যৌতুক দিতে হয়।

সাংস্কৃতিক রীতি ও ঐতিহ্যও পরিবারগুলোকে চাপ দেয়। অনেক সম্প্রদায়ে কিশোরী মেয়েকে বিয়ে দেওয়া সম্মানজনক হিসেবে বিবেচিত হয়, যা কন্যার সতিত্ব ও পরিবারের মানসম্মান রক্ষা করে। অবিবাহিত বয়স্ক মেয়েদের প্রতি সামাজিক কলঙ্কের কারণে অভিভাবকরা তাড়াহুড়ো করে মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেন, যা শিক্ষার সুযোগ বা ব্যক্তিগত পছন্দকে উপেক্ষা করে।

অপরদিকে, শিক্ষার সীমিত সুযোগ বিশেষত গ্রামীণ এলাকায় মেয়েদের ঝুঁকির মধ্যে ফেলে। দরিদ্রতা, বিদ্যালয়ের দূরত্ব বা নিরাপত্তাহীনতার কারণে যখন মেয়েরা পড়াশোনা ছেড়ে দেয়, তখন তারা অল্প বয়সে বিয়ে হওয়ার আশঙ্কায় পড়ে।

কারণসমূহ

১. দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক অস্থিরতা

দরিদ্র পরিবারগুলো মেয়ের পড়াশোনায় খরচ বহন করতে পারছে না, তাই মেয়েকে কম বয়সে বিয়ে দেওয়া হয় যেন পরিবারের বোঝা কমে যায়। যেমন, Kabir, Ghosh & amp; Shawly (২০১৯) অনুসন্ধানে পাওয়া গেছে শুধু দরিদ্রতাই না, শিক্ষার অভাব, সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি ও সচেতনতার অভাবও গুরুত্ব সহকারে কাজ করছে (www.thescipub.com)।

২. শিক্ষার অভাব ও বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া

মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা যদি থামিয়ে দেওয়া হয় বা তারা secondary বিদ্যালয়ে নিয়মিত যেতে না পারে, তাহলে বিয়ের সময় দ্রুত আগ্রহ বাড়ে। Multilevel Approach… (২০২৩) অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে, যে এলাকাগুলোতে মেয়েদের শিক্ষা স্তর নিচু, সেসব এলাকায় বাল্যবিবাহের হার অনেক বেশি (Bangla Jol)।

৩. সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রথা

পুরাতন রীতি-নীতি, লিঙ্গবৈষম্য, পিতৃতান্ত্রিক বিশ্বাস, ধর্মীয় ব্যাখ্যা ও সামাজিক মর্যাদার জন্য মেয়ের 'শরীর ও সম্মান' রক্ষার প্রতি চাপ সবই এই প্রথাকে বাড়িয়ে দেয়। মেহেরপুর জেলার গবেষণায় এই ধরনের সামাজিক ও পারিবারিক চাপ গুরুত্বপূর্ণভাবে উঠে এসেছে (philssj.org)।

৪. আইনগত ফাঁক ও কার্যকারিতা কম থাকা: স্থানীয় বাস্তবতা

'Child Marriage Restraint Act ২০১৭' আইনে ১৮ বছরের নিচে মেয়েদের বিয়ের ক্ষেত্রে 'বিশেষ পরিস্থিতি' ধারা রয়েছে, যা অভিভাবক ও আদালতের অনুমতির ভিত্তিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে। অনেকক্ষেত্রে এই ধারা অপব্যবহার করা হচ্ছে বলে আশঙ্কা রয়েছে। Policy & amp; Ethics প্রবন্ধে এ বিষয়টি বিশ্লেষিত হয়েছে (bjbio.bioethics.org.bd)।

পরিণতিসমূহ

১. শিক্ষার বিশৃঙ্খলা ও পড়াশোনা বিয়ে হওয়ার পর মেয়েদের বিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। Plan & amp; icddr-b এর জাতীয় জরিপে দেখা গেছে, বিয়ের সময় শিক্ষার্থী ছিল এমন অনেক মেয়েই গৃহবধূ হিসেবে পড়াশোনা বাদ দিতে হয়; গ্রামীণ এলাকায় এই হার বেশি (plan-international.org)।

২. শারীরিক ও প্রজনন স্বাস্থ্য ঝুঁকি অল্প বয়সে গর্ভধারণ ও প্রসব জটিলতা বেশি হয়। Kabir et al. (২০১৯)-এর কাজ এ বিষয়ে রিপোর্ট করেছে যে কিশোরী মাতাগণ শারীরিকভাবে প্রস্তুত নয়, ফলে গর্ভপাত, স্টিলবির্থ, শিশুর মৃত্যু ও মাতৃমৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ে (thescipub.com)।

৩. মনোরোগ ও মানসিক স্বাস্থ্যের প্রভাব মানসিক চাপ, উদ্বেগ, ভারসাম্যহীন সম্পর্ক, অবমাননা ও পারিবারিক সহিংসতার অভিজ্ঞতা বাড়ে। মেহেরপুর সংশ্লিষ্ট গবেষণায় এসব বিষয় উঠে এসেছে (philssj.org)।

৪. অর্থনৈতিক ও সামাজিক অপায় মেয়েরা অর্থ উপার্জন বা আত্মনির্ভর হয়ে উঠতে পারছে না। পরিবারগুলো দীর্ঘমেয়াদে দারিদ্র্যের চক্রে জড়িয়ে যায়। জাতীয় পরিসংখ্যান অনুসারে, বাল্যবিবাহ প্রেক্ষিতে গ্রামীণ ও নিম্ন-আয়ের পরিবারকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করছে (Bangla Jol+1)।

নীতিমালা ও রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা

- Child Marriage Restraint Act, ২০১৭: মেয়েদের জন্য ১৮, ছেলেদের জন্য ২১ বছর বিয়ের ন্যূনতম বয়স নির্ধারণ করা হয়েছে; তবে 'special circumstances' ধারা আইনকে কিছুটা ধোঁয়াশার মধ্যে রাখে (bjbio.bioethics.org.bd)।
- জাতীয় ও স্থানীয় সরকারের উদ্যোগ, এনজিও কার্যক্রম: মেয়েদের শিক্ষায় উৎসাহ বাড়ানো, সচেতনতা সৃষ্টি, পরিবার ও ধর্মীয় নেতাদের অংশগ্রহণ, ইত্যাদি কর্মসূচি চলছে।
- জাতীয় জরিপ ও তথ্য সংগ্রহ: Bangladesh Demographic and Health Survey (BDHS ২০১৭-১৮)-এর মতো ডাটা বিশ্লেষণ গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ সরবরাহ করে (Bangla Jol)।

চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশ

বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি। এর মধ্যে শিক্ষা সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার। মেয়েদের বিদ্যালয়ে রাখা হলে তাদের বিয়ে দেরিতে হয়, কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ে এবং তারা সচেতন সিদ্ধান্ত নিতে পারে। বৃত্তি, নিরাপদ যাতায়াত এবং ঝরে পড়া রোধে বিশেষ উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ। সম্প্রদায়ভিত্তিক সচেতনতা বাড়ানো দরকার। ধর্মীয় নেতা, অভিভাবক ও স্থানীয় প্রবীণদের যুক্ত করে ক্ষতিকর প্রথা ভাঙতে হবে এবং মেয়েদের শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরতে হবে।

সফল প্রচারণাগুলো প্রায়শই স্থানীয় পর্যায়ে আস্থা গড়ে তুলে ধীরে ধীরে মানসিকতার পরিবর্তন আনে। অর্থনৈতিকভাবে পরিবারগুলোকে শক্তিশালী করাও জরুরি। কর্মসংস্থান, কারিগরি প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তা দিলে পরিবারগুলো মেয়েদের দ্রুত বিয়ে দেওয়ার প্রবণতা কমাবে।

আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে। বেআইনি বিয়ে রোধে প্রশাসনকে কার্যকর হতে হবে এবং আদালত বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যেন আইনকে অপব্যবহার না করে তা নিশ্চিত করতে হবে। সরকারি সংস্থা, এনজিও ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের যৌথ প্রচেষ্টা দরকার। নিম্নে বাল্যবিবাহ রোধে কিছু সুপারিশ উল্লেখ করা হলো:

১. কড়া আইন প্রয়োগ ও 'special circumstance' ধারা পুনর্বিবেচনা আইন থাকলেও প্রয়োগ ও নজরদারি কম থাকায় বাস্তবে বাল্যবিবাহ বন্ধ হচ্ছে না। 'special circumstances' ধারা অপব্যবহার রোধ করা উচিত।

২. শিক্ষার গুণমান ও মেয়েদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বাড়ানো অবকাঠামো উন্নয়ন,

যাতায়াতের নিরাপত্তা, বৃত্তি বা আর্থিক সহায়তা, ইত্যাদি মাধ্যমগুলো কাজে লাগিয়ে মেয়েদের শিক্ষাজীবন চালিয়ে যেতে উৎসাহ দেওয়া যেতে পারে।

৩. সচেতনতা ও সামাজিক পরিবর্তন ধর্মীয় ও সামাজিক নেতাদের সঙ্গে কাজ করে সামাজিক মনোভাব পরিবর্তন করা জরুরি। মেয়েদের মর্যাদা, তাদের অধিকার ও সুযোগ সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়ানো।

৪. আর্থ-সামাজিক সহায়তা দরিদ্র পরিবারের জন্য লভ্যাংশমূলক অর্থায়ন, কর্মসংস্থান সুযোগ, মেয়ের দক্ষতা বৃদ্ধি, ইত্যাদি উদ্যোগ দরকার।

৫. স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সেবা পৌঁছানো কিশোরী মায়েদের জন্য প্রজনন স্বাস্থ্য, মানসিক স্বাস্থ্য ও পরিচর্যার সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।

উপসংহার

বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ একটি বহুমাত্রিক সমস্যা–গভীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা। বাল্যবিবাহ মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং জাতীয় উন্নয়নের অন্তরায়। দারিদ্র্য, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও লিঙ্গ বৈষম্যে শিকড় গাড়ায় এটি লাখো মেয়ের ভবিষ্যৎ নষ্ট করছে।

যদিও আইন ও নীতি আছে, ফলপ্রসূ বাস্তবায়ন ও সামাজিক পরিবর্তন ছাড়া সমস্যার মূলে আঘাত করা হবে না। গবেষণা প্রমাণ দেয় যে, মেয়েদের শিক্ষা, আইন, অর্থনৈতিক সক্ষমতা ও সামাজিক সচেতনতা বাড়ানোর মাধ্যমে বাল্যবিবাহ হ্রাস পেতে পারে। আইনি সংস্কার ও সচেতনতামূলক প্রচারণার মাধ্যমে কিছু অগ্রগতি হলেও সমস্যাটি সমাধানে আরও কাজ করা প্রয়োজন।

মেয়েদের শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া, পরিবারকে শক্তিশালী করা এবং আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করলেই বাল্যবিবাহ নির্মূল সম্ভব। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ শুধু শিশুদের রক্ষা নয়, বরং একটি ন্যায়সঙ্গত ও সমৃদ্ধ সমাজ গঠনের জন্য অপরিহার্য।

রেফারেন্স

1. Kabir, M. R., Ghosh, S., & Shawly, A. (2019). Causes of Early Marriage and Its Effect on Reproductive Health of Young Mothers in Bangladesh. American Journal of Applied Sciences, 16(9), 289-297. thescipub.com

2. Islam, M. A., Islam, M. K., Mamun, A. S. Md., Rana, M. S., & Hossain, M. G. (2023). Multilevel Approach of Factors Influencing Child Marriage among Bangladeshi Women: Data from the 2017-18 Bangladesh Demographic and Health Survey. International Journal of Statistical Sciences, 23(2), 63-73. Bangla Jol

3. Tasnim, N., Hossain, M. S., & Islam, M. Z. (2024). Causes and Consequences of Child Marriage in Rural Bangladesh: A Qualitative Study on Meherpur District. Philippine Social Science Journal, 7(2), 75-84. philssj.org

4. Patoari, M. H. (2020). Causes and Effects of Child Marriage in Bangladesh: A Case Study at Halishahar, Chattogram, Bangladesh. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 9(2), 162. richtmann.org
5. Plan International & icddr-b. National Survey on Child Marriage in Bangladesh: Findings from a National Survey. plan-international.org

লেখক: প্রজনন স্বাস্থ্য চিকিৎসক ও জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ

ফরিদা ইয়াসমিন

❖ একজন হিটু শেখ ও আমাদের কন্যাশিশু

সম্প্রতি আছিয়ার মতো একটি নিষ্পাপ কন্যাশিশুর অমানবিক মৃত্যু এবং তার প্রেক্ষিতে ধর্ষণকারীর মৃত্যুদণ্ড দেশব্যাপী আলোড়ন তৈরি করেছে। উক্ত শিশুটির ধর্ষণের শিকার হতে শুরু করে বিচার প্রক্রিয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত (০৬ মার্চ ২০২৫ হতে ১৭ মে ২০২৫) সারা দেশে আরও কিছু শিশু এ ধরনের ন্যাক্কারজনক ঘটনার শিকার হয়েছিল, যা বিভিন্ন মাধ্যমে জানা যায়। এ থেকে বোঝা যায়, আছিয়া ধর্ষণের ঘটনাটি দেশব্যাপী চাঞ্চল্য সৃষ্টি করলেও শিশুর প্রতি নিপীড়ন থেমে থাকেনি। অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও বর্বরতার অন্ধকার যুগ পেরিয়ে পৃথিবী এখন সভ্যতার সর্বোচ্চ শিখর ছুঁতে চলেছে। কিন্তু দুঃখজনক সত্য পৃথিবীর কিছু কিছু দেশে এখনো কন্যাশিশুরা উপেক্ষিত ও অবহেলিত; তন্মধ্যে বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতি এখনো কন্যাসন্তানের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করে; কন্যাসন্তানকে মানবসম্পদ না ভেবে বোঝা মনে করে, যা চরম বৈষম্যের প্রকাশ।

মাগুরা শহরের নিজনান্দুয়ালী গ্রামে বোনের শ্বশুরবাড়ি বেড়াতে গিয়ে ০৬ মার্চ ২০২৫ তারিখে ধর্ষণের শিকার হয় মাগুরার শ্রীপুর উপজেলার জারিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী আছিয়া। এ ঘটনার পর ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৩ মার্চ শিশুটির মৃত্যু হয়।

দেশে আছিয়ার মতো অনেক শিশু ও নারী প্রতিনিয়ত ধর্ষণ-নির্যাতনের শিকার হওয়ার ঘটনাগুলো কমই জানা যায়। ফলে সুষ্ঠু বিচার নিশ্চিত করা যায় না। আমরা চাই এ ধরনের প্রতিটি ঘটনাই বিচারের আওতায় আসুক এবং দ্রুত বিচার হোক। এজন্য পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট প্রতিটি সংস্থাকে তৎপর হতে হবে। শিশু আছিয়া ধর্ষণ-হত্যার ঘটনাটি এক্ষেত্রে একটি দৃষ্টান্ত হতে পারে। পাশাপাশি নারী-শিশুর নিরাপত্তায় দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিসহ দেশের সার্বিক পরিবেশ-প্রতিবেশের উন্নতিও জরুরি। শিশুর নিরাপত্তা ও অধিকার এবং মঙ্গলের প্রতি সার্বিক সুদৃষ্টি অতীব জরুরি।

দেশব্যাপী আলোচিত শিশু ধর্ষণ ও হত্যা মামলায় শিশুটির বোনের শ্বশুর হিটু শেখকে

মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। মামলার বাকি তিন আসামি হিটু শেখের স্ত্রী এবং দুই ছেলেকে আদালত বেকসুর খালাস দিয়েছে। গত ১৭ মে মাগুরা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক চাঞ্চল্যকর এ মামলাটির রায় ঘোষণা করেন। মামলার সাক্ষ্যগ্রহণ শুরুর ২১ দিনের মাথায় এবং মোট ১৪ কর্মদিবসে বিচারকার্য সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত মামলার ১নং আসামি হিটু শেখকে ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন (সংশোধিত ২০০৩)-এর ৯(২) ধারায় (ধর্ষণের ফলে মৃত্যুর অপরাধ) অভিযুক্ত করে আদালত সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড এবং ১ লাখ টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছেন। বাকি ৩ আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ না হওয়ায় তাদের বেকসুর খালাস দেওয়া হয়েছে। আদালত সূত্রে জানা যায়, শিশুটির বোনের স্বামী ও ভাসুরের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৫০৬ ধারার দ্বিতীয় অংশ (ভয়ভীতি প্রদর্শন) এবং বোনের শাশুড়ির বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ২০১ ধারায় (অপরাধের আলামত নষ্টের অভিযোগ) অভিযোগ গঠন করা হয়।

নারী ও শিশু নির্যাতনের সবচেয়ে ভয়াবহ এবং মারাত্মক রূপ হচ্ছে ধর্ষণ। এটি এমন একটি ক্রিয়া যা পুরুষতান্ত্রিক প্রভূত্বকে অব্যাহত রাখে। জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী নারী ও শিশুর সম্ভ্রমের ওপর চরম আঘাত হচ্ছে ধর্ষণ। এ আঘাত নারী-শিশুর নিরাপত্তাবোধ, মানবাধিকার, আত্মপরিচয়, মর্যাদা ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবোধের প্রতি হুমকিস্বরূপ।

কন্যাশিশুর প্রতি পারিবারিক অবহেলা, অবজ্ঞা ও অসচেতনায় শিশু আছিয়া ধর্ষণের ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে। কারণ আছিয়ার বড়বোনও অপরিপক্ক অবস্থায় হিটু শেখের পুত্রবধূ হয়েছে। তিনি হিটু শেখ তথা তার শ্বশুরের চরিত্রহীনতার বিষয়ে জানতেন। নিশ্চয়ই শিশু আছিয়াও দুশ্চরিত্র হিটু শেখ এর লোলুপদৃষ্টি জানতো বিধায় ওই বাড়িতে যেতে চায়নি; কিন্তু তার মা দরিদ্রতা, অজ্ঞতা ও অসচেতনতার কোনো কারণে বড় বোনের কাছে এতটুকু ভালো থাকার প্রত্যাশায় পাঠিয়েছিলেন। ফলশ্রুতিতে আছিয়ার মর্মান্তিক জীবনাবসান ও সন্তানহারা হলেন মা।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৪৫ শতাংশই ১৮ বছরের কম বয়সী শিশু, যার মধ্যে ৪৮ শতাংশই কন্যাশিশু ('জাতীয় ই-তথ্যকোষ' এর তথ্যানুযায়ী, বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২ কোটি ৩৯ লাখ জন কন্যাশিশু)। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও এদের অধিকাংশই জন্ম থেকে নানা বঞ্চনা ও বৈষম্যকে সঙ্গী করেই বেড়ে উঠছে। এতে তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে। ফলে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, দক্ষতা, আত্মবিশ্বাস ও সক্ষমতায় কন্যাশিশুরা ছেলেশিশুদের তুলনায় পিছিয়ে পড়ছে। এছাড়া কন্যাশিশুরা ব্যাপকভাবে যৌন সহিংসতার শিকার।

এভাবে সুরক্ষা ও নিরাপত্তার অধিকার কন্যাশিশুর জীবনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে। সুশাসনের অভাব, দারিদ্র্য, আইনি সহায়তা প্রাপ্তির অপ্রতুল সুযোগ কন্যাশিশুর জীবনকে প্রতিনিয়ত অরক্ষিত ও নিরাপত্তাহীন করে তুলছে। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের

সংরক্ষিত তথ্য থেকে জানা যায়, ২০২২ সালে ১ হাজার ৬২৯ জন কন্যা সহিংসতার শিকার হয়েছে। এর মধ্যে ধর্ষণ ৬৭২ জন, দলবদ্ধ ধর্ষণ ১২১ জন এবং ধর্ষণের পর হত্যার শিকার ২৮ জন। ধর্ষণের কারণে আত্মহত্যা করেছে সাতজন কন্যা। ধর্ষণের চেষ্টায় পীড়িত হয়েছে ৯৪ জন। এছাড়াও যৌন নিপীড়নের শিকার ১২২ জন, উত্যক্তকরণ ১০৪ জন, উত্যক্তকরণের জন্য আত্মহত্যা করেছে ছয়জন। কন্যাশিশুর প্রতি এই সহিংসতা তার সুরক্ষা ও নিরাপত্তার অধিকার হরণ করছে। রাষ্ট্র ও সমাজকে এই দায় অনুধাবন করে কন্যাশিশুর অধিকার সংরক্ষণের পদক্ষেপ নেওয়া অত্যাবশ্যকীয়।

কন্যাশিশুরা যেকোনো পরিস্থিতিতেই যৌন নিপীড়নের শিকার হয়ে থাকে এবং বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়, কোমলমতি শিশুরা পরিচিত পুরুষ দ্বারাই বেশি যৌন নিপীড়নের শিকার হয়। যার জলন্ত উদাহরণ মাগুরার আছিয়া, দিনাজপুরের পূজাসহ আরও অনেকে। তাই পিতা-মাতাসহ পরিবারের আপনজন যখন দেখেন যে, কন্যাশিশুরা কোন পুরুষকে ভয় পাচ্ছে, পরিহার করছে বা কোন স্থানে যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করছে তখন শিশুটির ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিতে হবে। তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা এবং পছন্দের অধিকার হলো অগ্রগণ্য শিশু অধিকার (Best Interest of Child)। বিশেষ করে–

- যৌন নির্যাতনের কথা বলা কোনো অশ্লীলতা নয়; লজ্জাজনক বিষয় নয়; বরং এটি শিশুদের প্রকাশের অধিকার।
- শিশুরা যখন নির্যাতনের শিকার হয়, সে যে ব্যক্তিই হোক না কেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাছের মানুষকে জানানো জরুরি।
- কোনো নির্যাতনকারী সাধারণত চট করে কাউকে নির্যাতন করে না। নানাভাবে আকার-ইঙ্গিতে নিজের ইচ্ছার কথা প্রকাশ করে। তাই এই ইঙ্গিতগুলো বোঝার জন্য শিশুসহ অভিভাবকদের মানসিকভাবে সচেতন থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে, কেউ যদি শিশুদের যৌন নির্যাতন করে, তাহলে সে অপবিত্র হয়ে যায়নি, সে অপরাধ করেনি; বরং নির্যাতনকারী অপরাধী। তাই শিশুরা নির্যাতনের শিকার হলে নিজেকে অপরাধী ভাবা যাবে না, মাথা নিচু করে থাকা যাবে না বা নষ্ট হয়ে গেছি–এমন চিন্তা করা যাবে না।
- লক্ষ রাখতে হবে নির্যাতনের ঘটনা জনে জনে অর্থাৎ সবাইকে বলার প্রয়োজন নেই। বাবা-মা আর একান্ত কাছের মানুষ, যাকে বললে মন হালকা হওয়া যায়–এমন কাউকে কথাগুলো বলতে হবে। নির্যাতন প্রতিরোধ করার জন্য কিছু কৌশল আছে; সেগুলো হলো– বাড়ির কাউকে আগে থেকেই মনে মনে ঠিক করে রাখা, যাকে নির্যাতনের কথা বলতে পারা যায় তিনি হবে শিশুর সুরক্ষাকারী। কেউ নির্যাতন করার চেষ্টা করলে চিৎকার করে উঠতে হবে, আশপাশের সবাইকে জানান দিতে হবে যে তার ওপর নির্যাতন হচ্ছে। ওই জায়গা থেকে দৌড়ে নিরাপদ জায়গায় বা মানুষজনের মাঝে সরে যেতে হবে। ওইদিনই যৌন নির্যাতনের ঘটনাটি সুরক্ষাকারীকে খুলে বলতে হবে।

● যদি যৌন নির্যাতনের জন্য মনোবিজ্ঞানী/কাউন্সেলর এর কাছে নেওয়া হয়, তবে তাকে নির্যাতনের কথা খুলে বলতে হবে। নির্যাতনের শিকার হলে এমন মনে না করা যে তার জীবন থেমে গেছে। বরং আগে যেসব কাজ করা হতো যেমন, লেখাপড়া, খেলাধুলা ও ধর্মীয় কাজ চালিয়ে যেতে হবে। শিশুদের সবাইকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখার কৌশল জানতে হবে। আর তাহলে তারা যৌন নির্যাতনের শিকার হওয়ার আগেই তা ঠেকাতে পারবে। যেমন: কথায় কথায় কেউ অশ্লীল/নোংরা চুটকি বা কথা বললে; শারীরিক সৌন্দর্য নিয়ে কথা বললে; তুমি খুবই যৌন আবেদনময়ী (সেক্সি) এমন কথা বললে; কথা বলার সময় শরীরের বেশি কাছাকাছি চলে এলে; বেশি বেশি ব্যক্তিগত প্রশ্ন করলে, যেমন, তোমার কি কারও সঙ্গে প্রেম চলছে?; তোষামোদি করলে অর্থাৎ সত্য নয় এমন বিষয়ে প্রশংসা করলে।

● এছাড়া ছেলেরা কোনো বাজে মন্তব্য করলে, চট করে রেগে না গিয়ে বরং শান্তভাবে উত্তর দিতে হবে। কারণ যে বাজের কথা বলছে সে সাধারণত রাগানোর জন্যই এমন কথা বলে। নোংরা ইঙ্গিত দিলে পরিষ্কার ভাষায় বুঝিয়ে বলতে হবে, 'আমি আপনার এই ব্যবহার পছন্দ করছি না। আপনি আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করবেন না'।

বাংলাদেশের নারী ও কন্যাসন্তানের ক্ষমতায়ন, উন্নয়ন ও অধিকারের পথ সবসময় প্রতিবন্ধকতায় ভরপুর। শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রযুক্তির উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব এগিয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশও কিন্তু নারীশিশুর প্রতি নির্যাতন এবং সহিংসতা নতুন নতুন আঙ্গিকে সংঘটিত হচ্ছে। ধর্ষণও এমন একটি বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধকতা, যার কারণে নারীশিশুকে সকল ক্ষেত্রে পদক্ষেপ গ্রহণের আগে নিজের নিরাপত্তার কথা ভাবতে হয় সর্বাগ্রে। সমাজের সকল স্তরে এবং শিশু অবস্থা থেকে আজীবন নারীকে সমাজের সকল স্তরে নিরাপত্তা প্রদান করতে পারলে নারী ও শিশুর গঠনমূলক ভূমিকাকে এগিয়ে নিতে পারলে একদিকে যেমন নারী-শিশু নিরাপদ থাকবে, অন্যদিকে নিজেদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নে অনন্য ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে।

এই পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্য কন্যাশিশুর প্রতি প্রচলিত মানসিকতার পরিবর্তন ঘটানো প্রয়োজন। আমাদের উপলব্ধিতে আনা প্রয়োজন যে, কন্যাশিশুরা শুধু বিবাহের পাত্রী বা ভবিষ্যৎ মা-ই নয়, তারা জাতির সম্পদ। কন্যাশিশুদের শারীরিক-মানসিক, আবেগীয় বিকাশ ও সুরক্ষা, সুস্থ ও সুন্দরভাবে বেঁচে থাকা, এবং তাদের সম-অংশগ্রহণের অধিকার প্রতিষ্ঠার ওপরই আমাদের জাতীয় অগ্রগতি বহুলাংশে নির্ভর করছে। তাই কন্যাসন্তানের সুরক্ষা ও তাদের অধিকারের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দেওয়াই হতে পারে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ।

লেখক: যুগ্ম পুলিশ কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ঢাকা।

বাবুল চন্দ্র সূত্রধর

❖ কন্যাশিশুর সুরক্ষায় দরকার নতুন ভাবনা

'আমার একমাত্র দোষ আমি নাকি দেখতে বেশ ভালো। তাই আমাকে বাইরে বের হতে দেওয়া যাবে না'– নবম শ্রেণির ছাত্রী জোনাকির লেখাপড়ার দরজা এখানেই এভাবেই চিরকালের জন্য রুদ্ধ হয়ে যায়। একদিকে পরিবারের সদস্য ও অপরদিকে প্রতিবেশীদের বিপরীতমুখী শলা-পরামর্শের যন্ত্রণায় অভিভাবকও দিশেহারা, অসহায়। এভাবে সমাজ থেকে বহু সম্ভাবনাময় জোনাকি হারিয়ে যায়। নীতি-নির্ধারণী মহলে এক একটি জোনাকি এক একটি পরিসংখ্যানিক সংখ্যামাত্র হলেও জোনাকি ও পরিবারের নিকট এটি শুধু একটি সংখ্যা নয়– জীবন, পরিবার, স্বপ্ন, সম্মান, উন্নতি, আরও কত কিছু।

মনে পড়ে, উচ্চ মাধ্যমিক সম্পন্ন হওয়া এক মেয়ের কথা, যিনি তার অমতে বিয়ের কথা পাকাপাকি হওয়ার পর পালিয়ে ঢাকা চলে আসেন এবং নিজের স্বপ্ন পূরণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। বাবা-মা তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। অতিশয় কষ্টে লেখাপড়া শেষ হওয়ার পর যখন তিনি বিসিএস কর্মকর্তা হলেন, তখন বাবা-মা তাকে হন্যে হয়ে খুঁজতে থাকেন। মেয়ের নিকট ভুল স্বীকার করে তাঁরা সম্পর্ক স্বাভাবিক করে তোলেন।

লেখাপড়া করলে সবাই বিসিএস কর্মকর্তা নাও হতে পারেন, কিন্তু জীবনের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। শিক্ষিত লোক, সে নারী বা পুরুষ যাই হোন, তার একটা বিস্তৃত মানসিক পরিমণ্ডল তৈরি হয়, যার ওপর ভিত্তি করে তিনি সমাজে কোনো না কোনো ইতিবাচক অবদান রাখতে সামর্থ্যবান হয়ে থাকেন। অন্তত একজন ভালো বাবা বা মা তো হতেই পারেন।

নারীর হাত ধরেই সভ্যতার বুনিয়াদ রচিত হয়েছিল বলে সামাজিক ইতিহাস জানায়। মানব সভ্যতার সবচেয়ে প্রাচীন ও মৌলিক সংগঠন পরিবার মূলত নারীর তত্ত্বাবধান ও কর্তৃত্বেই রচিত হয়। বন্যদশা ও বর্বরদশা প্রভৃতি ঐতিহাসিক কাল অতিক্রম করে মানুষ যখন পশুকে পোষ বানিয়ে গৃহপালিত প্রাণীতে পরিণত করতে সক্ষম হলো, তখন ধীরে ধীরে তারা সম্পদের মালিক হতে থাকে। সম্পদের মালিকানা যত এগিয়ে আসতে থাকে

সমাজে নারীর অবস্থান ততই অধস্তনতার দিকে ধাবিত হতে থাকে। ক্রমে নারীরা হলো গৃহবন্দী; সামাজিক স্তরবিন্যাস আলোচনায় অভিজ্ঞ বিশ্লেষকদের মতে, এটিই মানবসমাজে সৃষ্ট প্রথম ও অবৈজ্ঞানিক ভেদরেখা, যেখানে শরীরতাত্ত্বিক উপাদানগুলো বিবেচনার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করেছিল। এই পরিস্থিতির এক সুনিপুণ বর্ণনা প্রদান করেন জার্মান সমাজ-দার্শনিক ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস (১৮২০-১৮৯৫)। তিনি তাঁর বহুপঠিত 'The Origin of the Family, Private Property and the State' গ্রন্থে বলেন, "The downfall of maternal law was the historic defeat of the female sex. The men seized the reins also in the house; the women were stripped of their dignity, enslaved, tools of men's lust and mere machines for the generation of children. The first effect of the established supremacy of men became now visible in the reappearance of the intermediate form of the patriarchal family. Its most significant feature is not polygamy, of which more anon, but the organization of a certain number of free and unfree persons into one family under the paternal authority of the head of the family.''

মাতৃতন্ত্রের এহেন পরাজয় একটি স্থায়ী বাস্তবতা হিসেবে সমাজ ব্যবস্থায় টিকে গেল। অধিকন্তু, পরিবারে সীমিত না থেকে এটি সম্পত্তির উত্তরাধিকার, রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিকতা– সর্বত্র বিস্তৃত হয়ে পড়ল এবং নানা ধরনের শাখা-প্রশাখা গজানোর মাধ্যমে দিন দিন পরিপুষ্ঠি লাভ করতে থাকল। ফলে সমাজে স্বাধীন ও পরাধীন ব্যক্তিবর্গের সৃষ্টি হলো– একপক্ষে পুরুষ আর অন্যপক্ষে নারী। দৈহিক শক্তি যে এখানে অনন্য ভূমিকা পালন করেছে, সেটিও এঙ্গেলস নিরীক্ষণ করেছেন। এর ধারাবাহিকতা আজও বিদ্যমান। খুব তাড়াতাড়ি এই ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসবে, কিছু বাস্তব কারণেই এ আশাও করা যাচ্ছে না। বাংলাদেশের বিরাজমান নারী অধিকারের হালচাল থেকেই বিষয়টি অনুধাবন করা যেতে পারে।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ১লা জুলাই, ২০২৫ দেশের শীর্ষস্থানীয় ১৫টি জাতীয় পত্রিকা নিরীক্ষণ করে নারী ও শিশু নির্যাতনের একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, চলতি বছরের প্রথমার্ধ (জানুয়ারী-জুন, ২০২৫)-এ নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার মোট ঘটনা ১ হাজার ৫৫৫টি। ঘটনাগুলোর খণ্ডচিত্র নিম্নরূপ:

ঘটনার ধরন	নারী	শিশু	মোট
বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন	৮১৯	৯৩৬	১,৫৫৫
ধর্ষণ	৮৫	২৬৯	৩৫৪
দলবদ্ধ ধর্ষণ	৪৪	৬২	১০৬
ধর্ষণের পর হত্যা			১৭
ধর্ষণের কারণে আত্মহত্যা	০	৪	৪
উত্যক্তের শিকার			৫
উত্যক্তের জন্য আত্মহত্যা			২
আত্মহত্যা (অন্য কারণে)	১৬	৬	২২
হত্যা	৫৫	১৩	৬৮
রহস্যজনক মৃত্যু	৯	২	১১
অগ্নিদগ্ধ	৩	০	৩
অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু	২	০	২
বাল্যবিবাহ	০	২	২
মোট হত্যার শিকার	২৫৯	৬১	৩২০

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম তথ্য উপস্থাপনা শেষে কতিপয় মূল্যবান কথা বলেছেন: 'এ পরিসংখ্যান শুধু পত্রিকায় প্রকাশিত ঘটনার ওপর ভিত্তি করে। বাস্তবে সংখ্যাটা আরও বেশি। বিশেষ করে কন্যাশিশুর ওপর সহিংসতা ও দলবদ্ধ ধর্ষণের সংখ্যা উদ্বেগজনক। এটি সমাজের জন্য এলার্মিং। ছয় মাসে হাজারেরও বেশি নারী ও কন্যাশিশু নির্যাতনের শিকার হলেও মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বা সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কেউ কোনো প্রতিক্রিয়া দেননি, যা অত্যন্ত দুঃখজনক। আছিয়া ধর্ষণ মামলায় তড়িঘড়ি করে বিচার হয়েছে, কিন্তু ভালো তদন্ত না হওয়ায় পরিবার সন্তুষ্ট নয়। এ ধরনের বিচারে দ্রুততা নয়, নির্ভুলতা জরুরি।'

ফওজিয়া মোসলেমের এই কথাগুলো অতিশয় তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষত, সরকারি মহলের উদাসীনতা আসলে বিচারহীনতার সংস্কৃতিকে আহ্বানেরই নামান্তর। বিগত কয়েক বছরে এরূপ অপরাধের দায়ে মনে রাখার মতো বা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি কেউ পেয়েছে, আমার তা মনে আসছে না। খুনের মতো লোমহর্ষক ঘটনার পর্যন্ত তদন্ত হচ্ছে না, বিচার হচ্ছে না তাও তো আমাদের দেখতে হচ্ছে! বছরে সংঘটিত ২-৩ হাজার ঘটনার মধ্যে ২-১টির বিচার হলে মনে আসবেই কেমন করে? এটিও অতীব গুরুত্বের সঙ্গে দেখা দরকার যে, বিচারিক কার্যক্রমে দ্রুততার চেয়ে নির্ভুলতাই বিচারপ্রার্থী ও জাতির জন্য অধিক সুফল নিয়ে আসতে পারে।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ২০২৪ সালের প্রতিবেদনেও দেখা যায়, ১২ মাসে নারী ও

শিশু নির্যাতনের মোট ঘটনার সংখ্যা ২ হাজার ৫২৫টি; এর মধ্যে ১ হাজার ১০৬ জন শিশু ও ১ হাজার ৪১৯ জন নারী। পরিসংখ্যানের উপস্থাপনা নিয়ে আর পেছনে যেতে চাই না। কারণ এই চিত্র বা গ্রাফটি ক্রমশই ঊর্ধ্বমুখী। ২০২৪ সালের ১২ মাসে যেখানে ১ হাজার ১০৬ জন শিশু সহিংসতা বা নির্যাতনের শিকার হয়েছে, সেখানে ২০২৫ সনের প্রথম ৬ মাসে (জানুয়ারি-জুন) সংখ্যাটি দাঁড়িয়েছে ৯৩৬।

শিশু ও কিশোর-কিশোরীসহ সবচেয়ে অসহায় জনগোষ্ঠীর জন্য সহিংসতামুক্ত ও সুরক্ষামূলক পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর সঙ্গে কর্মরত ইউনিসেফ (জাতিসংঘ শিশু তহবিল নামে সমধিক পরিচিত) এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, "বাংলাদেশে ১-১৪ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে উদ্বেগজনকভাবে প্রতি ১০ জনে ৯ জন শিশু প্রতিমাসে সহিংস পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছে। এটি প্রতি মাসে সাড়ে চার কোটি শিশুর ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। শিশু সুরক্ষায় অগ্রগতি সত্ত্বেও সহিংসতা, নিপীড়ন ও শোষণ-বঞ্চনার কারণে লাখ লাখ শিশু ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।' কন্যাশিশুরা এহেন পরিস্থিতির শিকার হচ্ছে অধিক মাত্রায়, একথা বলাই বাহুল্য।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত 'নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০১৩-২০২৫)'-এর পটভূমি অংশে নারী ও শিশু নির্যাতনের বিষয়টিকে আন্তর্জাতিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে এবং বিশ্বের প্রতি তিন জনে একজন নারী নির্যাতনের শিকার হন, জাতিসংঘের এই পরিসংখ্যানটি তুলে ধরে বলেছে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সহিংসতার ধরনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন হচ্ছে। সত্যিই তো, ধর্ষণ হচ্ছে, কিন্তু এর মাত্রাটি কত বীভৎস! অনুরূপভাবে, উত্যক্তকরণ, দলবদ্ধ ধর্ষণ, যৌতুকের দাবি ও গ্রহণ, হত্যাকাণ্ড প্রভৃতির ক্ষেত্রেও অবর্ণনীয় বীভৎসতার খবর পাওয়া যায়।

এই পরিসংখ্যান ও পরিস্থিতির প্রতিকূলে মেয়েরা কী রূপ যুদ্ধ করে এগিয়ে চলেছে, বিবেকবানরা একটু ভেবে দেখুন। সামান্য তথ্য যোগ করি। এবারের (২০২৫) এসএসসি পরীক্ষায় পাশের হারে ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা এগিয়ে রয়েছে। যেখানে ছেলেদের পাশের হার ৬৫.৮৮%, সেখানে মেয়েদের পাশের হার ৭১.০৩%; গড় ৬৮.৪৫%। বিগত ১০ বছর ধরে এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে মেয়েদের এহেন সফলতার প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে। জিপিএ-৫ প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও এবারে মেয়েরা এগিয়ে রয়েছে; মোট ১,৩৯,০৩২ জনের মধ্যে মেয়ে ৭৩,৬১৬ (৫২.৯৫%) জন ও ছেলে ৬৫,৪১৬ (৪৭.০৫%) জন।

এ তো গেল পরিমাণগত তথ্য; কিছু গুণগত তথ্যও যোগ করার মতো। তথ্যগুলো ছোট আবার কারো কারো নিকট হাস্যকর হতেও পারে, কিন্তু আমার নিকট সুস্পষ্ট ঈঙ্গিতবহ।

রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার কাঁকনহাট এলাকায় একবার ভ্যানে করে মাঠকর্মে যাওয়ার পথে স্কুলের সামনে এসে একটি মেয়ে নেমে খুচরো টাকার অভাবে পাঁচ টাকা ভাড়া দিতে পারছিল না। আমি বললাম, 'তোমার ভাড়া আমি দিয়ে দেব'। ষষ্ঠ বা সপ্তম শ্রেণির পড়ুয়া মেয়েটি মৃদু হাসি নিয়ে বলল, 'যদি থাকে, আপনি বরং আমাকে খুচরো টাকা দিন, আমার ভাড়া আমিই দিই'। তাই করতে হলো। আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলাম মেয়েটির মনের সম্পূর্ণতা ও সম্পন্নতা দেখে। ঢাকার টিকাটুলীতে দেখেছি, এক বৃদ্ধ সবজিওয়ালার ভ্যানের চাকা গর্তে আটকে গেলে স্কুল ফেরত কিছু মেয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভ্যানটি ঠেলে তুলে দিয়েছিল। কাজটি করতে পেরে তাদের চোখে মুখে কী যে তৃপ্তি! কী যে আনন্দ! রাস্তায় আরও লোকজন ছিল; কিন্তু দায়িত্বটি পালন করতে হল এই মেয়েগুলোকেই। সুষ্ঠু মূল্যায়ন ও পরিবেশের নিশ্চয়তা পেলে এই মেয়েরাই অসাধ্য সাধন করতে পারে– আমি সর্বান্তকরণে তা বিশ্বাস করি। সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্বশাসিত- সহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোতে কর্মরত আমাদের দেশের মেয়েরা কি ভালো করতে পারছে না? পারিবারিক পরিমণ্ডলে গুরুদায়িত্ব পালনের কথা না হয় বাদই দিলাম!

আমার দেখা মতে, বর্তমানে সহ-শিক্ষা চালু রয়েছে, এমন গ্রাম বা শহরের অধিকাংশ স্কুলে ছেলের তুলনায় মেয়ের সংখ্যা বেশি। এও জেনেছি যে, মেয়েরা লেখাপড়ায়ও ভালো ও মনোযোগী; কোনো কোনো শ্রেণিতে প্রথম দশজন শিক্ষার্থীর মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা অধিক।

ফিরে যাই চার দশক আগে– বিগত শতকের আশির দশকে। ১৯৭৯ সনে আমি আমার গ্রামের উচ্চ বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হই। ৮৪ জনের মধ্যে মেয়ে শিক্ষার্থী ছিলেন মাত্র ১৫ জন। আবার, দশম শ্রেণিতে ওঠা অবধি অর্ধেকের বেশিই তাদের স্থায়ী ঠিকানা বদল করে ফেলেন!

আমি আমার অফিসের কাজে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যাওয়ার সুবাদে বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেখতে পাই। স্কুল ছুটির পর মেয়েরা যখন দল বেঁধে বাড়ির দিকে ছুটে চলে, আমি গভীর মনোযোগ দিয়ে তা দেখি। মেয়েদের সুশৃঙ্খল হাঁটাচলা আমাকে মুগ্ধ করে; ভাবি– এরা যখন দেশের সেবায় নিয়োজিত হয়ে বিভিন্ন পদের চেয়ার দখল করে বসবে, তখন ঠিকই দেশের চেহারা পাল্টে যাবে।

আলোচনার শেষদিকে এসে তাই কন্যাশিশুদের সুরক্ষার বিষয়ে নতুনভাবে ভাববার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মহলের প্রতি আহ্বান জানাই। ভাববার কিছু প্রাথমিক উপকরণও এ প্রসঙ্গে যুক্ত করতে চাই: যে সমাজব্যবস্থায় সৌন্দর্য কারো দোষ বা অপরাধের হেতু হয়ে উঠেছে, এক পক্ষ (নারী) অন্য এক পক্ষের (পুরুষ) সহযোগী না হয়ে ভোগের বস্তু বলে বিবেচিত হচ্ছে, মেয়ের মা-বাবা হওয়ার কারণে অগণিত লোককে সন্ত্রস্ত অবস্থায় দিন কাটাতে হচ্ছে, মেয়ে হয়ে জন্ম নেওয়ার কারণে স্বাধীন দেশে পরাধীনের মত চলাফেরা করতে

হচ্ছে, সে সমাজব্যবস্থার ভেতরে কী কী উপাদান কী কী উপায়ে শক্তি সঞ্চয়ে সমর্থ হয়ে উঠেছে, তা উদ্‌ঘাটন করা অত্যাবশ্যক। তাই জোর দিয়ে বলতে চাই, সরকারি বা বেসরকারি, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক কোনো পক্ষ যদি আসলেই নারী, শিশু ও অপরাপর বিপন্ন লোকজনের উন্নয়নের জন্য কার্যকর কিছু করতে চান, তাহলে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বর্ণিত পরিস্থিতি সামনে রেখে বিরাজমান সমাজব্যবস্থার অনুপুঙ্খ চিত্র সর্বসমক্ষে উপস্থাপন করতে পারেন। প্রচলিত আইন কিংবা নৈতিকতা কেন এক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে ব্যর্থ হয়ে পড়ছে, সে বিষয়টিও একইসঙ্গে অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

লেখক: মানবাধিকারকর্মী ও গবেষক।

মিথুশিলাক মুরমু

❖ নিরাপত্তাহীনতায় আদিবাসীদের বাল্যবিবাহ!

১৪ জানুয়ারি রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তার বরাবর একজন আদিবাসী অভিভাবক আবেদন করেছিলেন, শিরোনাম– 'বাল্যবিবাহ রোধ এবং আইনি সহায়তার জন্য আবেদন'। মোহনপুর ইউনিয়ন বাবুডাইং গ্রাম-এর সুশীল হাঁসদা লিখেছেন, 'আমি সুশীল হাঁসদা মোহনপুর ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ড বাবুডাইং গ্রামের বাসিন্দা। আমার মেয়ে বর্তমানে নবম শ্রেণির ছাত্রী শ্যামলী হাঁসদা (১৫) গত ১১ জানুয়ারি ২০২৪ ছেলেপক্ষ আমার মেয়েকে জোর করে তাদের বাসায় নিয়ে গিয়ে বিয়ে দিয়ে ফেলে। এ বিষয়ে আমরা অবগত ছিলাম না। জানামতে, ছেলে অপ্রাপ্তবয়স্ক। ছেলের নাম অজিত মুরমু, পিতা মৃত. লুবেন, মাতা-সুন্দরী হাঁসদা মোহনপুর ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ড বসতপুর গ্রামের বাসিন্দা। সকলের অমতে বিয়েটা সম্পন্ন করা হয়। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় মতে, দু'জনই অপ্রাপ্তবয়স্ক। আমাদের গ্রামে বাল্যবিয়ের প্রবণতা অনেক বেশি। আর এই বাল্যবিয়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত অনিল হাঁসদা শান্তিপাড়া গ্রাম প্রধান। ২০২৩ সালে নয়টি বাল্যবিয়ে সংঘটিত হয়েছে। ১১ জানুয়ারি এই বিয়েতে তিনি জড়িত আছে। বাল্যবিয়ে যাতে আর না হয় এবং আমার মেয়ের যে বাল্যবিয়ে হয়েছে সে বিষয়ে আদিবাসী সমাজ থেকে মেয়ের বাবা হিসেবে প্রতিকার চাইছি।'

খবর নিয়ে জানার চেষ্টা করেছি, স্থানীয় প্রশাসন কোনো উদ্যোগ নিয়েছেন কি না! সত্যিকার অর্থে গোদাগাড়ী উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা তাদের বিষয়ে সময় ব্যয় করতে আগ্রহী হননি। আদিবাসী কোল সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা স্থানীয় এনজিও 'তাবিথা ফাউন্ডেশন' (টিএফ) ও 'ন্যাশনাল এজেন্সি ফর গ্রীন রেভ্যুলেশন' (এনএজিআর)-এর সহযোগিতায় সামান্য এগিয়ে গেলেও অতল গহব্বর থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। মূলত স্থানীয় প্রশাসনের এই উপেক্ষা ও উদাসীনতায় অগ্রসরমান কোল যুবরা খুবই হতাশ ও ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখছেন।

বাবুডাইং গ্রামের উদীয়মান তরুণ রাজেন কোল চিঠিটি আমাকে প্রেরণ করেন এবং অনুরোধ করেছেন আগামীতে বাল্যবিবাহ বন্ধে যেন কিছু একটা করা যায়। ঘটনার পরবর্তীতে কয়েকবার কোল জনগোষ্ঠীর গ্রামগুলোতে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে, সত্যিই

আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি এবং সচেতনতার ঝাণ্ডা নিয়ে পাশে না দাঁড়ালে বাল্যবিবাহ রোধ করা কঠিন ও চ্যালেঞ্জের। আমরা অবলোকন করেছি, দিনাজপুরের বিরামপুর, কাটলা ইউনিয়নের বেণীপুর সাঁওতাল পল্লীতে বাল্যবিবাহ রোধে ও সচেতনতা বাড়াতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আদিবাসী গ্রামে নারী-পুরুষ, সন্তান-সন্ততি, পৌঢ়-যুবদের উদীপ্ত করতে সচেষ্ট হয়েছে উন্নয়ন ও সামাজিক সংগঠনগুলো। স্থানীয় শিল্পীদের কণ্ঠে ছিল বাল্যবিবাহের কুফল, কুপ্রথা এবং ভবিষ্যতের সুন্দর জীবন সম্পর্কে হাতছানি। বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনে অপরাধীদের শাস্তি সম্পর্কে প্রশাসনের পক্ষ থেকে আইনি সহায়তার কথা তুলে ধরা হয়। গানে বাল্যবিবাহের শারীরিক, মানসিক, পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যার কথাও ওঠে আসে। পরিশেষে উপস্থিত সাঁওতাল আদিবাসীরা হাত উত্তোলন করে নিজ পরিবারে ও গ্রামে বাল্যবিবাহ হতে দেবেন না বলে অঙ্গীকারবদ্ধ হন। আরেকটি দৃষ্টান্ত– আদিবাসী ওরাঁওদের বাল্যবিবাহ বন্ধে সিরাজগঞ্জের তাড়াশের রামবল্লভপুর গ্রামে সুশীল কুমার মাহাতো প্রতিষ্ঠা করেছেন, 'সিরাজগঞ্জ আদিবাসী প্রমিলা ফুটবল একাডেমি'। ২০২০ সালে প্রতিষ্ঠিত একাডেমিতে বর্তমানে ৩২ আদিবাসী কিশোরী পড়ালেখার পাশাপাশি ফুটবল কসরত রপ্ত করে চলেছেন। সহজ সরলভাবে উদ্দেশ্যটি বর্ণনা করেছেন, 'মূলত মোবাইলের অপব্যবহার, বিদেশি টিভি চ্যানেলে দিনরাত ডুবে থাকা, সঙ্কোচ, লজ্জাসহ নানা কারণে পিছিয়ে পড়া এলাকার আদিবাসী কিশোরীদের বাল্যবিয়ে পুরো আদিবাসী নারী সমাজ দিন দিন আরও পিছিয়ে দিচ্ছে। এছাড়া অপ্রাপ্ত বয়সে তারা ভারী কাজে বাধ্য হচ্ছে। একদিকে যেমন সমূহ সম্ভাবনাময় কিশোরীদের জীবন বিষিয়ে উঠছে, তেমনি নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতেও তারা পিছিয়ে পড়ছে। এসব বিষয়কে সামনে রেখে নিজ উদ্যোগে আদিবাসী কিশোরীদের সুস্থ-সুন্দর জীবন গঠন ও প্রতিষ্ঠিত করতে সিরাজগঞ্জ আদিবাসী প্রমিলা ফুটবল একাডেমি প্রতিষ্ঠা'। ইতোমধ্যেই একাডেমি থেকে বিকেএসপি-সহ স্থানীয় পর্যায়ে খেলাধুলায় বেশ সুনাম অর্জন করেছে। বিশেষত এখানে মাদকাসক্তদের সন্তান ও যেসব কিশোরী বাল্য বিয়ে করবে না তাদেরকেই আদিবাসী প্রমিলা ফুটবল একাডেমিতে ভর্তি করা হয়।

দেশের উত্তরাঞ্চলের অধিকাংশ আদিবাসী পরিবার এখনও তাদের জীবিকার জন্য কৃষি ও কৃষি সম্পর্কিত পেশার ওপর নির্ভরশীল। এদের প্রায় ৮৭ শতাংশ পরিবার ভূমিহীন, ৫ শতাংশ পরিবার প্রান্তিক কৃষক এবং ৩ শতাংশ পরিবার মধ্য কৃষক, ২ শতাংশ পরিবার ধনী কৃষক। উল্লেখিত এই সামাজিক স্তর-বিন্যাসের আওতায় ভূমিহীন আদিবাসীরা কাজের অভাবে বেকার থাকছে বছরের প্রায় অর্ধেক সময়। এর ফলে পুরো উত্তরবঙ্গে বসবাসরত আদিবাসীদের প্রায় ৯০ শতাংশ পরিবার চরম দারিদ্র্যের শিকার হয়ে বছরের প্রায় ছয় মাস চরমভাবে খাদ্যের অনিশ্চয়তাসহ চিকিৎসা, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত অবস্থায় মানবেতর জীবন-যাপন করছে। আদিবাসীদের প্রতি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সামাজিক শোষণ, বৈষম্যমূলক ও বর্ণবাদী আচরণ আদিবাসী সামাজের প্রান্তিকীকরণের আরেকটি কারণ হিসেবে প্রতীয়মান হয়। কারণ অর্থনৈতিক শোষণের পাশাপাশি সামাজিক বৈষম্যতা, বঞ্চনা ও অস্পৃশ্যতার শিকার এই আদিবাসী জনগোষ্ঠী।

বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর দ্বারা নির্যাতনের শিকার হয় কিনা এমন এক প্রশ্নে রাজশাহী গোদাগাড়ীর ১৬টি আদিবাসী গ্রামের শতকরা ৩০.৮ ভাগ উত্তরদাতা বলেছে তারা নির্যাতনের শিকার হন। নির্যাতনের ধরন সম্পর্কে জানতে চাইলে শতকরা ৩৮.৮ ভাগ বলেছেন যে তারা শারীরিকভাবে নির্যাতনের শিকার হন। বসতি থেকে উচ্ছেদের হুমকির কথা বলেছেন শতকরা ৩৫.৭ ভাগ, নারী নির্যাতন-এর কথা বলেছেন শতকরা ১৩.৩ ভাগ উত্তরদাতা।

আদিবাসী নারীরা নিজ সমাজের তুলনায় বৃহত্তর সমাজ থেকে অধিক নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন। পরিবারের কন্যাশিশুরা বেড়ে ওঠলেই মা-বাবাদের উৎকণ্ঠা ক্রমশই বাড়তে থাকে। বৃহত্তর সমাজের তরুণদের দ্বারা নিগৃহীত হলে কোনো সময়ই ন্যায়বিচারের দৃষ্টান্ত মেলেনি। বৃহত্তর সমাজের মোড়ল-মাতব্বরা আদিবাসী ভুক্তভোগী পরিবারটিকে নয়-ছয় বুঝিয়ে থাকে। ভুক্তভোগী পরিবারটি সামাজিক, মানসিক ও অর্থনৈতিকভাবে চরম ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। সমাজে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেন না। ফলস্বরূপ সমাজে বাল্যবিবাহের প্রভাব সম্ভুক গতিতে অগ্রসর হতে থাকে, কোনোভাবেই ঠেকানো বা নির্মূল করা যাচ্ছে না। আদিবাসীদের সচেতনতা বাড়াতে সরকারি- বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন নব নব উদ্যোগ, প্রয়োজন স্থানীয় প্রশাসনের আইনি তৎপরতা। একজন ধর্ষকের পরিচয় শুধুই ধর্ষক। কিংবা শ্লীলতাহানি যারা করে, তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় আনা না গেলে, প্রান্তিক আদিবাসীদের আশ্বস্ত করা দুরূহ কাজ। বাল্যবিবাহের অভিশাপ থেকে উত্তরণে এখনই সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থ হলে আদিবাসী সমাজ আরও ক্ষয়িষ্ণু হবে এবং বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে পৌঁছাতে সময় নেবে না।

শাস্ত্রে বলে, ন্যায়বিচার জাতিকে উন্নত করে। রাষ্ট্রকে নাগরিকদের বিশেষত সংখ্যালঘু আদিবাসীদের দুঃখ-কষ্টে, নির্যাতন-অত্যাচারে দায়িত্বশীল আচরণ থেকে বিরত থাকলে, আমরা উন্নত জাতিতে রূপান্তিত হবো না। দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর নারী-পুরুষের অভাব-অভিযোগ আমলে নেওয়া ও ন্যায়ত নিষ্পত্তিই আমাদের প্রশাসনের নিরপেক্ষতার মানদণ্ড। ক্ষমতাহীন, দুর্বল, নিরক্ষর ও পিছিয়ে পড়াদের আইনের সুফল দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার মধ্য দিয়েই দেশের পবিত্র সংবিধানে বর্ণিত– 'আইনের চোখে সবাই সমান' প্রতিষ্ঠা করার নৈতিক দায়িত্ব প্রশাসনের।

আমি বিশ্বাস করি, আইনের যথার্থ প্রয়োগের মধ্যে দিয়েই আদিবাসীদের বাল্যবিবাহ অর্ধেকে নেমে আসবে, বাকি অর্ধেকের জন্য প্রয়োজন নিবিড়ভাবে সচেতনতা।

আসুন, আদিবাসীদের বাল্যবিবাহের অভিশাপ থেকে বাঁচাতে উদ্যোগী হই, অগ্রণী ভূমিকা পালন করি।

লেখক: উন্নয়নকর্মী ও আদিবাসী লেখক।

মোহাম্মদ ইয়াসিন আরাফাত

❖ পরিবারে শিশুর নির্যাতন ও প্রতিকার

বাংলাদেশে শিশুর প্রতি নির্যাতন একটি গুরুতর সামাজিক সমস্যা। পরিবার হচ্ছে শিশুর সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয় হওয়ার কথা, কিন্তু দুঃখজনকভাবে অনেক সময় এই পরিবারই হয়ে ওঠে ভয়ের জায়গা। অনেক শিশু তাদের বাবা-মা বা অভিভাবকের হাতে শারীরিক, মানসিক ও কখনো যৌন নির্যাতনের শিকার হয়।

শিশুর প্রতি নির্যাতনের ধরন:

১. শারীরিক নির্যাতন: মারধর, বেত্রাঘাত, শারীরিক শাস্তি দেওয়া।
২. মানসিক নির্যাতন: গালি, অপমান, ভয় দেখানো, হুমকি দেওয়া।
৩. অবহেলা: পর্যাপ্ত খাবার, শিক্ষা, চিকিৎসা বা ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত রাখা।
৪. যৌন নির্যাতন: শিশুর প্রতি অশোভন আচরণ বা যৌন হয়রানি।

শিশুদের ওপর প্রভাব

শিশুকে শাসনের নামে মারধর, লাঞ্ছনা বা গালি দেওয়া আমাদের সমাজে এখনও স্বাভাবিক বলে মনে করা হয়। তবে এ ধরনের আচরণ শিশুদের ওপর দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। অনেক শিশু বাবা-মায়ের হাতে খাবার থেকে বঞ্চিত হয়, পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়, এমনকি ভয় ও লজ্জায় অসুস্থ হয়ে পড়ে।

এই ধরনের নির্যাতন শিশুদের শারীরিক ক্ষতি করে, আবার মানসিকভাবে ভেঙে ফেলে। তারা ভয়, হীনমন্যতা, আত্মবিশ্বাসের অভাব এমনকি আত্মহত্যার চিন্তায় আক্রান্ত হতে পারে। ভবিষ্যতে এরা সমাজে সুস্থভাবে বেড়ে ওঠতে ব্যর্থ হয়।

কেন বাবা-মা এ ধরনের নির্যাতন করে?

- দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক চাপ
- মাদকাসক্তি
- অশিক্ষা ও অজ্ঞতা
- নিজেদের শৈশবের অভিজ্ঞতা
- মানসিক অসুস্থতা।

উদ্বেগের পরিসংখ্যান

▪ দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২১ সালে ৮১৮ শিশুকে ধর্ষণ করা হয় এবং ১৮৩ জনকে হত্যা করা হয়।

▪ ভিউস বাংলাদেশ প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৫ সালের প্রথম ছয় মাসে ১ হাজার ৯৩৩ শিশু নির্যাতনের ফলে মৃত্যুবরণ করেছে; এ সময় ধর্ষণের শিকার হওয়া শিশুর সংখ্যা ২ হাজার ৭৪৪ এবং অন্যান্য শারীরিক বা মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে ২ হাজার ১৫৯ জন।

▪ আইন ও সালিশ কেন্দ্রের তথ্যমতে, চলতি বছরের প্রথম সাত মাসে শিশুধর্ষণের ঘটনা গত বছরের তুলনায় প্রায় ৭৫% বেড়েছে, যেখানে ২০২৫ সালের জানুয়ারি-জুলাই পর্যন্ত ৩০৬ জন, আর ২০২৪ সালের একই সময়ে ১৭৫ মামলা ছিল।

▪ ইউনিসেফ-এর ২০২৪ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ১-১৪ বছর বয়সী ৯০ ভাগ শিশু প্রতি মাসে ঘরোয়া সহিংসতার শিকার হয়, যা প্রায় ৪৫ মিলিয়ন শিশুকে প্রভাবিত করে।

শিশু কীভাবে নির্যাতন থেকে রক্ষা পেতে পারে?

শিশু নির্যাতন সরাসরি প্রতিরোধ করা অনেক সময় সম্ভব হয় না। তবে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া যায়। যেমন:

▪ বিশ্বাসযোগ্য মানুষের সঙ্গে তথ্য শেয়ার করা। যেমন, আত্মীয়, শিক্ষক, প্রতিবেশী।

▪ জাতীয় শিশু সহায়তা হটলাইন '১০৯৮', যা বাংলাদেশ সরকারের বিনামূল্যের জরুরি হেল্পলাইন।

▪ শিশু অধিকার বিষয়ক এনজিও যেমন, ব্র্যাক, সেভ দ্য চিলড্রেন, অ্যাপেক্স-এর ভূমিকা, যারা আইনি ও মানসিক সহায়তা প্রদান করে।

▪ বিদ্যালয় বা স্থানীয় জনপ্রতিনিধির সহায়তা নেওয়া।

▪ নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্র বা শিশু পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিচালনা, যেখানে শিশু অস্থায়ীভাবে থাকতে পারে।

শিশুদের মানসিক ও সামাজিক নিরাপত্তা

▪ শিশুদের নির্যাতনের তথ্য গোপন রাখলে বা বাধ্য হয়ে লজ্জায় স্তব্ধ হয়ে গেলে মামলা দায়ের কমে যায়। এমন অনেক ঘটনা নথিভুক্ত হয় না।

▪ পরিবার ও সমাজে সহিংসতা ও নির্যাতনের সংস্কৃতি বন্ধ করা প্রয়োজন। বিশেষ করে অশিক্ষা, দারিদ্র্য ও সামাজিক লজ্জার কারণে অনেকে অভিযোগ করা থেকে বিরত থাকেন।

আইনি কাঠামো ও বিধি-ব্যবস্থা

▪ 'শিশু এবং নারী নির্যাতন দমন আইন, ২০০০': এই আইনে শিশুদের প্রতি যৌন ও শারীরিক নির্যাতনের শাস্তির বিধান রয়েছে। তবে, সাম্প্রতিক সময়ে শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে প্রস্তাবিত 'anti-grooming' আইন এখনও অনুপস্থিত। অর্থাৎ আচরণগত

মনস্তাত্ত্বিক ফাঁদে ফেলা (grooming) এখনো অপরাধ হিসেবে স্বীকৃত নয়।

Children Act, ২০১৩: ২০১৩ সালে পাশ হওয়া এই আইন শিশুদের অধিক কার্যকর সুরক্ষা প্রদান করে। এর গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলো হলো:

▪ ধারা ৪: শিশু হিসেবে ১৮ বছরের নিচে ব্যক্তি নির্ধারণ করা হয়েছে;

▪ অধ্যায় ৯ (ধারা ৭০-৮৩): শিশু নির্যাতনের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে। যেমন ধারা ৭০ অনুযায়ী, শিশুর যত্নে থাকা ব্যক্তি তাকে নির্যাতন, অবহেলা বা মানসিক/শারীরিক ক্ষতি করলে ৫ বছরের জেল অথবা ১ লাখ টাকা জরিমানা বা উভয় শাস্তি হতে পারে;

▪ ধারা ৭১ এবং ৭২: শিশুকে ভিক্ষা করানো, মদ্যপ অবস্থায় শিশুর তত্ত্বাবধান করার শাস্তি বিধান করে;

▪ ধারা ৩৩-৩৪: শিশু অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া যাবে না; তবে সর্বোচ্চ ১০ বছরের জন্য 'Child Development Center'-এ রাখা যেতে পারে;

▪ ধারা ৩২: শিশু মামলার বিচার ৩৬০ দিনের মধ্যে শেষ করতে হবে, প্রয়োজন পড়লে আরও ৬০ দিন বাড়াতে পারেন;

▪ আইন বিচার প্রক্রিয়ার মনোরমতা: Children Court-এ বিচার শান্ত পরিবেশে, সীমিত উপস্থিতিতে হয়; মিডিয়ায় শিশুদের পরিচিতি প্রকাশ নিষিদ্ধ।

▪ দণ্ডবিধি, ১৮৬০: ধারা ৩৭৫ ও ৩৭৬ অনুযায়ী ধর্ষণকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ ঘোষণা করা হয়েছে, তবে শিশুদের ওপর grooming-যুক্ত আচরণ শুধু ধর্ষণ হওয়ার পরে অপরাধ হিসেবে গণ্য, গুরুতর একটি আইনি ফাঁকিকে উপেক্ষা করা হয়েছে।

▪ Domestic Violence (Prevention and Protection) Act, ২০১০: এই আইনের ধারা ৩ শিশুদের ওপর পারিবারিক সহিংসতাকেও অন্তর্ভুক্ত করে। ধারা ৭ ঘএঙ বা নিবন্ধিত সংস্থা শিশুদের আইনগত, চিকিৎসা ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করতে পারে।

▪ হটলাইন ও পুনর্বাসন ব্যবস্থা

▪ Child Helpline ১০৯৮: সারাদেশে ২৪*৭ ফ্রি কল সেবা, যা ২০১০ সালে সরকার অনুমোদিত হয়ে চালু হয়। Aparajeyo-Bangladesh এই হটলাইন পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে; এদের সোশ্যাল সেন্টার শিশুর পরামর্শ, উদ্ধার ও পুনর্বাসনে কাজ করে।

▪ এনজিও ও সমন্বিত প্রচেষ্টা।

▪ বিচার ও আইনি সহায়তা

▪ Ain o Salish Kendra (ASK): শিশু ও নারী অধিকার রক্ষায় আইনি সহায়তা, সামাজিক সেবা প্রদানকারী সংগঠন।

▪ Child Rights Advocacy Coalition in Bangladesh (CRACB): দশটি এনজিও নিয়ে গঠিত এই গোষ্ঠী শিশু অধিকার রক্ষা ও আইনি সংস্কারে কাজ করে ।

▪ সচেতনতা ও পুনর্বাসন

▪ Bangladesh Shishu Adhikar Forum (BSAF): শিশু জন্ম থেকে অধিকার ও সুরক্ষায় কাজ করে, trafficking, child labour, pornography ইত্যাদি বন্ধে প্রচারণা চালায়।

▪ Rupantar: শিশু-যুব অধিকার রক্ষায় সামাজিক সচেতনতা ও নীতি-সংশ্লেষে কাজ করে।

▪ Sanjog Bangladesh: যৌন ও আর্থিক নির্যাতন প্রতিরোধে সচেতনতা ও সেবা প্রদান করে।

▪ Compassion International Bangladesh: শিশু স্বাস্থ, শিক্ষা, আইনি ও মানসিক সহায়তা প্রদান করে।

▪ Manusher Jonno Foundation, Aparajeyo, Mastul Foundation, IYCM ইত্যাদি বিভিন্ন এনজিও অভিন্নভাবে শিশু সুরক্ষা ও সমর্থনে কাজ করে।

কাঠামোগত চ্যালেঞ্জ ও প্রস্তাবনা

সমন্বয়ের অভাব: বিভিন্ন মন্ত্রণালয় (শ্রম, মহিলা ও শিশু বিষয়ক, সমাজকল্যাণ) একত্রে কাজ না করে জানিয়ে এনজিওরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এ জন্য একটি পৃথক শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর গঠনের দাবি রয়েছে।

আইনি ফাঁক-ফোকর: grooming বলতে মানসিক প্রস্তুতি ও বিশ্বাস তৈরি। এখনো অপরাধের পরেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়। 'anti-grooming' আইন পাশ হলে নির্যাতনের আগেই প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।

সমাজ ও রাষ্ট্রের করণীয়

▪ পরিবারকে শিশু লালন-পালনের প্রশিক্ষণ দেওয়া;
▪ স্কুলে শিশুদের অধিকার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি;
▪ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সক্রিয় ভূমিকা;
▪ শিশু নির্যাতনের অভিযোগ দ্রুত তদন্ত ও বিচার সম্পন্ন করা; এবং
▪ গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারণা বৃদ্ধি।

শেষকথা

শিশু হলো জাতির ভবিষ্যৎ। পরিবারে যদি তারা নির্যাতনের শিকার হয়, তবে তাদের সুস্থ বিকাশ ব্যাহত হয়, যার ফলে পুরো সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শিশুকে নিরাপদ পরিবেশ দেওয়া আমাদের নৈতিক ও আইনি দায়িত্ব। প্রতিটি শিশু যেন ভয়মুক্তভাবে বেড়ে উঠতে পারে, সেটি নিশ্চিত করা জরুরি।

লেখক: লেখক ও উন্নয়নকর্মী।

লাভলী মানসী দাজেল

❖ কন্যাশিশু ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্যতা

ভূমিকা

এ জগতে প্রত্যেক মানুষের পরিচিতি বিভিন্ন সংস্কৃতির ওপরই নির্ভর করে। পরিচিতি প্রদানেই পরিষ্কার হয়ে যায় তিনি কোন লিঙ্গের? অনুমান করা যায় তিনি কোন দেশের? কোন বংশের? এবং কোন জাতি গোষ্ঠীর? পদবী দেখেই সহজেই অনুমান করা যায় যে শিশুটি কোন জাতি গোষ্ঠীর ও লিঙ্গের। নাম দেখেই দেশীয় লোকেরা নিশ্চয়ই সত্য জেনে নিতে পারে যে সে একজন নারী। আবার একটু অসুবিধা হতে পারে সে কোন অঞ্চলের, হ্যাঁ তবে সেটি অবশ্যই যে কেউ অনুমান করতে পারবে যে সে হয়তো আদিবাসী দলের একজন সদস্য।

আমার প্রিয় দেশ বাংলাদেশে আমার জন্ম। আমি গারো মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় জন্মগ্রহণ করে গর্ববোধ করি। কারণ গারোরা আদিকাল থেকেই মাতৃকূলীয় হিসেবে পরিচিতি লাভ করে সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হিসেবে। মায়ের পদবী নিয়েই সন্তানেরা পরিচিতি লাভ করে এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। গারোদের সম্পত্তিকে মাহারী সম্পত্তি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে থাকে। গারো ছেলেরা সাধারণত মেয়ের ঘরে গর্বের সঙ্গে জামাই যায়। বর্তমানে যদিও শিক্ষিত অধিকাংশ ছেলেরা আর জামাই যেতে আগ্রহী নই। ছোটকাল থেকেই লক্ষ করেছি আমাদের অঞ্চলে অনেক বিদেশি দম্পত্তি বেড়াতে আসলে, তাঁদের সম্বর্ধনা দেওয়ার সময়, মঞ্চে স্বামী স্ত্রী একসঙ্গে যেতেন, কিন্তু একসঙ্গে পাশাপাশি যাওয়াকে অনেকেই সহজে মেনে নেয়নি। কারণ সংস্কৃতি সমর্থন করে না। স্বামী-স্ত্রী আগে পিছে যেতে হয়। শিক্ষণীয় থাকলেও সংস্কৃতির কারণে অধিকাংশ সময় আমরা মেনে নিতে পারি না বা সমর্থন করি না।

দক্ষিণ এশিয়ার সংস্কৃতি

নিশ্চিত করে বলতে পারি দক্ষিণ এশিয়ার মেয়েরা বা কন্যাশিশুরা সংস্কৃতির অপশক্তির কারণে চিরদিন অবহেলিত ও নির্যাতিত। সংস্কৃতির অপশক্তির কারণে কন্যাশিশুরা মেধা, শক্তি সামর্থ থাকলেও নিজস্ব প্রতিভাকে সঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারছে না। কন্যাশিশুদের উপযুক্ত পরিবেশ ও সুযোগ সৃষ্টি করে দিলে তারা স্বশিক্ষিত ও উচ্চশিক্ষা

গ্রহণ করে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে। পরিবারের একজন স্ব-উপার্জনক্ষম সদস্য হতে পারে। একজন শিক্ষিত মা সন্তান গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। সন্তানদেরকে উপযুক্ত পরামর্শ ও নির্দেশনা দিয়ে সুনাগরিক গঠন করতে পারে। অথচ আমরা দক্ষিণ এশিয়ার লোক, সংস্কৃতির ওপর ভিত্তি করে কন্যাশিশুদের প্রতি অজান্তে, নিবৃতে সুবিধাবঞ্চিত করে চলেছি। কন্যাশিশুদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও অপসংস্কৃতি হেতু অন্ধকারে ক্রমশই ঠেলে দিচ্ছি।

সতীদাহ প্রথা

দক্ষিণ এশিয়ার কন্যাশিশুরা একসময় সংস্কৃতির নিষ্ঠুর নিয়মে স্বামীর চিতায় ঝাপ দিয়ে মরতে হতো। সমাজ বিশ্লেষকরা মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার বিশ্লেষণ করে বলেছেন একমাত্র সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে বঞ্চিত করার জন্যই এই প্রথা চালু ছিল। ধন্যবাদ দিই যারা এ প্রথা রোধকল্পে বিভিন্নভাবে কাজ করেছেন এবং মানবিকতাকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন। সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা জানাই এমনিভাবে অনেকের অন্তর আবারও যেন নাড়া দেয় এবং সচেতনতা বৃদ্ধি পায়।

বায়োলজিক্যাল সৃষ্টি

কন্যাশিশু ও ছেলেসন্তানের মধ্যে বয়ঃসন্ধির সঙ্গে সঙ্গে অনেক দিক থেকে বৈসাদৃশ্য দেখা যায়। চিকিৎসা বিদ্যায় যেটিকে বায়োলজিক্যাল সৃষ্টি হিসেবে আমরা সকলই একমত। কণ্ঠস্বর বদলে যায়। ছেলেদের দাড়ি গোঁফ গজাতে থাকে। শারীরিক গঠনের পরিবর্তন দেখা যায়। নিজেকে লুকাতে চেষ্টা করে। লজ্জা বুঝতে চেষ্টা করে। আমাদের দেশের আবহাওয়া অনুসারে বলা হয় তারা মা ও বাবা হওয়ার যোগ্যতাও অর্জন করতে থাকে। তাই বয়ঃসন্ধিকে গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষিত মা-বাবারা সতর্কতায় সন্তানদের সঙ্গে সহভাগ করে। বয়ঃসন্ধিক্ষণ ছেলে-মেয়েদের অবাধ মেলামেশাকে সংস্কৃতি অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বয়ঃসন্ধিক্ষণ ছেলে-মেয়েদের অবাধ মেলামেশাকে সংস্কৃতি অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করাকে সাধুবাদ জানাই। আবার নিয়ন্ত্রণ যেন কঠোর ও রুক্ষ হয়ে না পড়ে, সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। বয়ঃসন্ধির মেলামেশাকে, বহু বছর আগেই শরৎ বাবু উল্লেখ করেছিলেন– বাল্য প্রেমের যে অভিশাপ আছে।

মাসিক হওয়া সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত আশীর্বাদ

আমি একজন শাশুড়ি মা। আমার আত্মীয়-স্বজন, প্রিয়জন সকলেই প্রায়ই জিজ্ঞেস করে আমরা দাদু-দিদিমা হয়েছি কিনা? সকল বাবা-মা চায় সন্তানের বিবাহ জীবনের পর তাদের কোলজোড়ে যেন সন্তান আসে। কিন্তু বিবাহ করলেই কি সন্তান আসবে? তাই সন্তান হওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো– কন্যাশিশুদের মাসিক হওয়া এবং এটি সৃষ্টিকর্তার প্রদত্ত আশীর্বাদ। কারণ মাসিক না হলে কোনো কন্যাশিশু মা হওয়ার সক্ষমতা রাখে না। বিবাহের পর যে কোনো দম্পতি সৃষ্টিকর্তার কাছে সন্তানের জন্যে আকুতি-বিনতি করে থাকে। ছেলে-মেয়েদের বিবাহ দিয়ে নাতি-পুতি দেখার মনোবাসনা

জাগে। সন্তান জন্মগ্রহণেই বংশ রক্ষা হতে পারে বা মানব জাতির বংশবৃদ্ধি হতে পারে। পরামর্শ আছে মাসিক হওয়ার সময় মেয়েরা যেন সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। বর্তমান সময়ে ডিজিটাল যুগে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়ার অনেক সুযোগ রয়েছে। সামাজিক রীতি-নীতি অবশ্যই পালন করে কন্যাশিশুরা সমাজে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠা করবে। জানা যায়, দক্ষিণ এশিয়ার অনেক জাতিগোষ্ঠী মাসিক হওয়াকে অপব্যাখ্যা করে কন্যাশিশুদের মাসিক চলাকালীন কমপক্ষে ৫ থেকে ৭ দিন পর্যন্ত অন্ধকার ঘরে আটকিয়ে রাখা হয়, বিভিন্ন খাবার পরিবেশন সীমিত করে এবং বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ও সাধারণ জীবনযাপন থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়। ফলে কন্যাশিশুদের শরীর প্রায়ই জটিলতা দেখা দেয়। এমনটা যেন কোনো কন্যাশিশুর ক্ষেত্রে না হয় বর্তমান ডিজিটাল বাবা মা ও সভ্য সমাজ সেদিকে গুরুত্ব দিচ্ছে বলে আমি আশাবাদী।

ডিজিটাল ও কন্যাশিশু

ডিজিটালে কন্যাশিশুরা প্রতিনিয়তই বিরক্তিকর পরিবেশের মধ্যে যেতে হচ্ছে। যে সকল কন্যাশিশুরা বিভিন্ন অ্যাপস ব্যবহার করছে তাদের ফোন কল অনবরত আসতেই থাকে। অ্যাপসে নাম দেখেই বুঝতে পারে সে তরুণ না তরুণী? একটু উদাসীনতা বা অসতর্কতার জন্যে কন্যাশিশু অল্প সময়ের মধ্যে নেটের দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে। ডিজিটালের মারপ্যাঁচে অনেক অবলা কন্যাশিশুরা নিগৃহীত হচ্ছে। প্রতিনিয়ত বিরক্তিকর পরিবেশের মধ্যে যেতে হচ্ছে। কিছু অসাধু মানুষ প্রতারণা করে মেয়েদের অনাকাঙ্ক্ষিত ছবি পোস্ট করতেও দ্বিধাবোধ করে না। আমরা আশা করব, ডিজিটাল জগত যেন কোনো কন্যাশিশুর জন্য অভিশাপের কারণ না হয়। ডিজিটাল হোক উন্নয়নের, কলঙ্কের নয়।

কন্যাশিশুরা ক্ষমতাবান

সময়মতো কন্যাশিশুরাও একদিন সুখের সংসার করে, বিধি অনুযায়ী একজন স্বামীর ঘরে সংসার রচনা করে। ডিজিটাল ও সভ্য জগতের অনেক শিক্ষিত স্বামীরা স্ত্রীদের, স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে সুখের সংসার রচনা করেন। সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছায় মা হওয়ার যোগ্যতা দান করেন। সন্তান ধারণ করেন দশ মাস দশ দিন। কঠিন সময় ও সমস্যাবহুল জীবন পাড়ি দেয়। দুটি সত্তার আবির্ভাব, বাড়তি খাবারের প্রয়োজন, এ সময় স্বামীর নৈতিক সমর্থন ও আন্তরিক সাহায্য-সহযোগিতা একান্ত অপরিহার্য। নিরক্ষর মা-বাবাদের দ্বারা অনেক সময় অপসংস্কৃতির কারণে অনেক কিছু ঘটে থাকে, যা মমতাময়ী মা ও শিশু সন্তানের জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

একজন মায়ের কন্যাশিশু জন্মগ্রহণের জন্যে এককভাবে মা দায়ী নয়। কন্যাশিশু জন্মগ্রহণ বা বালিকা বিদ্যালয় গড়ার ক্ষেত্রে বাবাকেও দায়ভার নিতে হয়, মা এককভাবে দায়ী নয়। আমাদের অপসংস্কৃতি পরিহারের মানসিকতা অবশ্যই থাকতে হবে। অন্যথায় সমাজের উন্নতি কখনও হবে না।

মনোভাব/দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন

দক্ষিণ এশিয়ার লোকদের মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজন। কন্যাশিশুদের প্রতি যে মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গি সেটি পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজন। কন্যাশিশুরা ভোগের বিষয় নয়, তারা মানুষ, তারা মা, তারা বোন।

সমাজে ও দেশে অন্যায় ও অন্যায্যতা বেড়ে যাচ্ছে। ধর্ষণের সংখ্যা বেড়েই যাচ্ছে। ধর্ষণের শিকার হওয়ার একমাত্র কারণ মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গি। মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হলে ধর্ষণ কমে যাবে। অন্যায়, অন্যায্যতার জন্যে অশান্তি ও অরাজগতা বৃদ্ধি পায় এবং সমাজ ও দেশের দুর্নাম হয়। সৃষ্টিকর্তা মানবজাতিকে শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। তাই শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ হিসেবে পশুত্ব স্বভাব পরিহার করা একান্ত দরকার।

ইতিবাচক ব্যাখ্যা

প্রমাণ করছে এবং দক্ষিণ এশিয়ার কন্যাশিশুরা বলছে– 'হ্যাঁ আমরা পারি'। উক্তিটি প্রমাণ করে, তারা কেউ বিমান পাইলট, তারা কেউ সেনা কর্মকর্তা, তারা কেউ বিচারক, তারা কেউ প্রশাসক, তারা কেউ ডাক্তার, তারা কেউ ইঞ্জিনিয়ার, তারা কেউ সেবিকা, তারা কেউ ভালো খেলোয়াড়, তারা কেউ অ্যাটলেটিকস, তারা কেউ সাঁতারু, আবার তারা আদর্শ গৃহিণী। কন্যাশিশু একজন আদর্শ মা। স্বামীর কাছে একজন আদর্শ স্ত্রী। শ্বশুর-শাশুড়ির কাছে একজন আদর্শ বৌমা। তারা পারে।

উপসংহার

সুধী পাঠকবৃন্দ, আমরা কন্যাশিশুদের কীভাবে দেখতে চাই? বিমান পাইলট? আর্মি অফিসার? বিচারক? প্রশাসক? ডাক্তার? প্রকৌশলী? আমাদের কন্যাশিশুরা যদি এসব পদে আসীন থেকে কাজ করে আমরা কি গর্ববোধ করব? না লজ্জাবোধ করব?

আমি বিশ্বাস করি, আমরা সকলেই চাই আমাদের সকল সন্তানেরা যেন সুনাগরিক ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে জীবন ধারণ করে। সুখের সংসার রচনা করে।

আমাদের দায়িত্ব বৈষম্য নয়, সকলের জন্যে সমান সুযোগ সৃষ্টি করা। অপসংস্কৃতি নয়, কিন্তু ইতিবাচক ও উন্নয়নমূলক সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করা। সংস্কৃতি হোক কন্যাশিশুদের আশীর্বাদ ও অনুকূলের আধাঁর। সকলের জন্য শুভকামনা।

লেখক: লেখক ও শিক্ষক।

রহমান মৃধা

❖ আসছে কন্যাশিশু দিবস: প্রতীক নয়, চাই বাস্তব পরিবর্তন

কন্যাশিশুদের অধিকার ও লিঙ্গ সমতার প্রশ্ন বহু পুরানো। উপমহাদেশে অতীতে, বিশেষ করে ভারতের কিছু অঞ্চলে 'সতীদাহ' প্রথা এবং অনুরূপ সামাজিক কায়দা-কানুন মেয়েদের জন্মের সময় থেকেই সীমাবদ্ধতা আরোপ করত। যদিও এই প্রথাগুলো এখন ইতিহাসের পাতায় স্থান পেয়েছে, তবে তাদের প্রভাব আজও বাংলাদেশের সমাজে কোনো না কোনোভাবে প্রতিফলিত হয়। মেয়েদের শিক্ষা, স্বাধীনতা এবং সামাজিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে এখনও কিছু বাধা ও সাংস্কৃতিক বাধ্যবাধকতা বিদ্যমান। এমন পরিবেশে, উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নারী শিক্ষার্থীদের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করার চেষ্টা করলেও, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতা পুরোপুরি অদৃশ্য হয়নি।

কন্যাশিশুর জীবন জন্মের পর থেকেই নানা সীমাবদ্ধতার ভেতর দিয়ে শুরু হয়। প্রারম্ভিক শৈশব থেকেই তাদের শিক্ষা, খেলাধুলা ও সামাজিক অংশগ্রহণ সীমিত হয়ে থাকে। দরিদ্র পরিবারের শিশুদের ক্ষেত্রে এই প্রতিবন্ধকতা আরও তীব্র হয়; তারা প্রায়শই পরিবারের অল্প আয়ের ওপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠে। বস্তি বা নিম্ন আয়ের এলাকায় বড় হওয়া কন্যাশিশুরা প্রতিদিন খাবারের নিরাপত্তা, পরিচ্ছন্ন পানি, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষার সুযোগ এবং সামাজিক নিরাপত্তার জন্য সংগ্রাম করে। তাদের প্রতিটি সিদ্ধান্ত পরিবার ও সামাজিক কাঠামোর নিয়ন্ত্রণে থাকে। কৈশোরে পৌঁছে তারা প্রায়শই কর্মসংস্থান, অল্প বয়সে বিয়ে অথবা ঘরোয়া দায়িত্বের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। এর ফলে তাদের স্বাধীনতা সীমিত হয় এবং তারা নিজের স্বপ্ন ও আগ্রহ পূরণে ব্যর্থ হয়। এই বাস্তবতা কেবল ব্যক্তিগত দারিদ্র্য নয়, বরং সমাজ ও সংস্কৃতির গভীরে প্রোথিত এক বৈষম্যমূলক কাঠামোর প্রতিফলন।

কৈশোরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে কন্যাশিশুর চ্যালেঞ্জ আরও গভীর হয়। বস্তি এলাকায় গোসল করার জন্য নিরাপদ বাথরুমের (গোসলখানা ও শৌচাগার) অভাব, অন্ধকারে চলাফেরার ঝুঁকি এবং পরিচ্ছন্নতার ঘাটতি তাদের দৈনন্দিন জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে। প্রযুক্তির যুগে অনেক সময় তাদের ছবি বা ভিডিও তুলে গণমাধ্যমে প্রচার করা

হয়, যা একদিকে তাদের বাস্তব দুর্দশা প্রকাশ করে, অন্যদিকে সামাজিক চাপ ও লজ্জার কারণ হয়। এই অভিজ্ঞতাগুলো নারীর স্বাধীনতা ও বিকাশের পথকে আরও সীমিত করে।

বাংলাদেশে শিশুবিবাহ এখনও বড় একটি সামাজিক অভিশাপ। ২০-২৪ বছর বয়সী মেয়েদের মধ্যে প্রায় ৬৫ শতাংশের বিয়ে হয়েছে ১৮ বছরের আগেই, যা বিশ্বে অন্যতম শীর্ষ হার। শারীরিক ও মানসিকভাবে অপ্রস্তুত অবস্থায় বিয়ে হওয়ার কারণে তাদের স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ে, শিক্ষার অধিকার নষ্ট হয় এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ হারিয়ে যায়।

বাংলাদেশে লিঙ্গ সমতার ক্ষেত্রে কিছু অগ্রগতি হয়েছে বটে, তবে বাস্তব চিত্র ভিন্ন। শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে নারীরা এখনও পুরুষদের তুলনায় পিছিয়ে। পাশাপাশি যৌন হয়রানি, সহিংসতা ও বৈষম্য সমাজের গভীরে রয়ে গেছে।

প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, ভারত ও পাকিস্তানে শিশুবিবাহ ও শিক্ষা নিয়ে একই ধরনের প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান। শ্রীলঙ্কা তুলনামূলকভাবে এগিয়ে, যেখানে সরকারি স্কুলে বালিকাদের জন্য স্বাস্থ্য পরীক্ষা, নিরাপদ বাথরুম ও বৃত্তিমূলক সহায়তা নিশ্চিত করা হয়েছে। এই আঞ্চলিক বাস্তবতা প্রমাণ করে যে বাংলাদেশের সমস্যা একক নয়, বরং সমাধানও আঞ্চলিক সহযোগিতা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে আসতে পারে।

সুইডেন একটি ধনী দেশ হিসেবে লিঙ্গ সমতার অগ্রগামী উদাহরণ। সেখানে নারী-পুরুষের সমান অধিকার আইন দ্বারা নিশ্চিত, পিতৃত্বকালীন ছুটি নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য সমান, কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য প্রতিরোধে কঠোর ব্যবস্থা আছে এবং সহিংসতা প্রতিরোধে কার্যকর আইন প্রয়োগ করা হয়। যদিও বাংলাদেশের বাস্তবতা ভিন্ন, সুইডেনের অভিজ্ঞতা দেখায় কীভাবে আইন, নীতি ও সামাজিক সচেতনতার মাধ্যমে নারীর স্বাধীনতা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করা যায়। বাংলাদেশের জন্য সুইডেনের নীতিগত মডেল এবং প্রতিবেশী দেশগুলোর শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতা উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশে প্রতি বছর জাতীয় কন্যাশিশু দিবস পালন করা হয়। কিন্তু এর উদ্দেশ্য ও ফলপ্রসূতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটি কেবল আনুষ্ঠানিকতা, প্রদর্শনী বা বক্তৃতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। কন্যাশিশুর প্রকৃত অধিকার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কার্যকর পদক্ষেপ খুব কমই দেখা যায়। ফলে দিবসের প্রকৃত তাৎপর্য প্রান্তিক ও দরিদ্র কন্যাশিশুদের জীবনে পৌঁছায় না।

বাস্তব উদাহরণে দেখা যায়, ঢাকার বস্তি এলাকার রাশিদা তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণে স্কুলে যেতে পারেনি এবং পরিবার তাকে কাজের মেয়ে হিসেবে কাজে পাঠিয়েছে। অন্যদিকে শ্রীলঙ্কার সরকারি স্কুলগুলোতে বালিকাদের জন্য স্বাস্থ্য পরীক্ষা, নিরাপদ বাথরুম এবং শিক্ষাসুবিধা রয়েছে, যা বাংলাদেশের অনেক কন্যাশিশুর জন্য এখনো অধরা স্বপ্ন।

এই পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্য জরুরি কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রথমত, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে বালিকাদের শিক্ষায় অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে হবে। দ্বিতীয়ত, কিশোরী মেয়েদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, পরিচ্ছন্নতার প্রশিক্ষণ এবং নিরাপদ স্যানিটেশন নিশ্চিত করতে হবে। তৃতীয়ত, পরিবার, সম্প্রদায় ও স্থানীয় নেতাদের মধ্যে লিঙ্গ সমতা ও কন্যাশিশুর অধিকার নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে হবে। সর্বশেষে, শিশুবিবাহ, সহিংসতা ও যৌন হয়রানি প্রতিরোধে কঠোর আইন প্রয়োগ অপরিহার্য।

কন্যাশিশুর অধিকার ও লিঙ্গ সমতা নিশ্চিত করতে সমাজ, সরকার এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। প্রতিবেশী দেশগুলোর শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতা ও সুইডেনের নীতিমূলক মডেল থেকে শিক্ষা নিয়ে বাংলাদেশে কন্যাশিশুদের জন্য সমান সুযোগ ও অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব। সামাজিক কাঠামো পরিবর্তন, শিক্ষার প্রসার, স্বাস্থ্যসেবা, আইন বাস্তবায়ন এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রতিটি কন্যাশিশুর জীবনকে নিরাপদ, সমৃদ্ধ ও মর্যাদাপূর্ণ করা যায়।

আসছে কন্যাশিশু দিবস-২০২৫। এই দিনটি হোক আশা ও প্রত্যাশার প্রতীক। যেন প্রতিটি কন্যাশিশু আলোর দিশারী হয়ে ওঠতে পারে, তার অধিকার, স্বপ্ন ও সম্ভাবনা অনন্তে বিস্তৃত হোক। এই দিবস কেবল আনুষ্ঠানিক উদ্‌যাপন নয়, বরং সমাজের প্রতিটি স্তরে কন্যাশিশুর জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করার বাস্তব পদক্ষেপের প্রতীক হয়ে উঠুক। তাদের ভবিষ্যৎ হোক আলো, ফুল ও প্রজাপতির মতো স্বাধীন, উজ্জ্বল ও সম্ভাবনাময়।

লেখক: লেখক, গবেষক ও সাবেক পরিচালক, ফাইজার, সুইডেন।

সাদিয়া করিম

❖ অদম্য ইচ্ছেশক্তি দিয়ে স্বপ্নকে সত্য করি, নতুন সমাজ বিনির্মাণ করি

একটি শিশু তার পরিবার থেকেই প্রথম তার ভাবনাগুলোকে পরিশীলিত করতে শেখে। কোনটি সমাজকর্তৃক স্বীকৃত, কোনটি করলে সে সমালোচিত হবে, কোনটি করলে সে মূল্যায়িত হবে, সে বিষয়গুলো মাথায় রেখেই কিন্তু শিশুটি পূর্ণাঙ্গভাবে তাকে প্রকাশ করতে থাকে। তাই একটি শিশুকে জেন্ডার সংবেদনশীল হিসেবে গড়ে তুলতে হলে সবার দায়িত্বশীল আচরণ প্রয়োজন। খুব ছোট ছোট ঘটনাও শিশুদের কোমল মনে একটু একটু করে দাগ কাটতে থাকে। ছোট মেয়েশিশু যেমন বড় হতে হতে শোনে মেয়ে হওয়ার ফলে সে কী করতে পারবে আর কী পারবে না। একইভাবে ছোট ছেলেশিশু উপলব্ধি করতে শেখে শুধু ছেলে হয়ে জন্ম নেওয়ার কারণে তার সামনে কী অবারিত সুযোগের হাতছানি রয়েছে, যাতে তার কোনো অবদান ছিল না। বেশিরভাগ সময়, এসব কিছুই তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

এখনও আমাদের সমাজে জেন্ডারভিত্তিক শ্রম বিভাজন চরমভাবে প্রতীয়মান এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এর দ্বারাই মেয়েশিশু এবং ছেলেশিশুর পরবর্তী জীবন আবর্তিত হয়। প্রথমত এই সামাজিকীকরণে মেয়েশিশুরা অনেক ক্ষেত্রে ছেলেশিশুদের থেকে পিছিয়ে পড়তে থাকে এবং যত দিন যায় তত তা পর্বতপ্রমাণ হতে থাকে। আবার অনেক মেয়েশিশু এসব বাধা-বিপত্তি ডিঙ্গিয়ে নিজেদের শাণিত করলেও বা তার দক্ষতাকে উন্মোচিত করলেও সে তা চর্চা করার সুযোগ পায় না বা সমাজ কর্তৃক নিরুৎসাহিত করা হয়। আরও অবাক হওয়ার বিষয় হচ্ছে এটিকে প্রাকৃতিক বিষয় হিসেবে আখ্যায়িত করার অপচেষ্টা চলে অবিরতভাবে। ছেলেশিশু এবং মেয়েশিশুকে যেভাবে বড় করা হয় দুটি বিষয়ই চরম ভাবাপন্ন। এ কথা এখন সর্বজনবিদিত যে, জেন্ডার সহিংসতার মূলে রয়েছে জেন্ডার বৈষম্য। তাই কোমলমতি শিশুদের ছোটবেলা থেকেই জেন্ডার সমতার ব্যাপারে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক।

কিশোর বয়স থেকে ছেলেশিশুটি ধীরে ধীরে অবলোকন করে যে, যৌন হয়রানি বা সহিংসতা করে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সমাজকর্তৃক দায়মুক্তি পাওয়া যায়। এই টুকরো টুকরো ঘটনাগুলোর সামষ্টিক রূপ হিসেবে পরবর্তীতে আমরা দেখতে পাই বড় ধরনের কোনো অঘটন বা

অপরাধ। আমরা জানি যে, সহিংসতার বহিঃপ্রকাশ করতে হলে একজন ব্যক্তিকে তার চারপাশের অবস্থা বিবেচনা করতে হয় এবং তিনি যার ওপর নির্যাতন করবেন তার থেকে অপরাধী ব্যক্তি ক্ষমতা কাঠামোর কোন পর্যায়ে আছেন তা গুরুত্বপূর্ণ। এরকম অনেক ঘটনা আমরা দেখি যে, ব্যক্তি পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির জন্য প্রয়োজনে অনেক বেশি নম্র এবং দায়িত্বশীল আবার সেই ব্যক্তিই সুযোগে অনেক থেকে বেশি হিংস্র হয়ে পড়তে পারেন। তাছাড়া যার প্রতি তিনি সহিংসতা প্রকাশ করছেন তার সামাজিক মর্যাদা, শিক্ষা, জীবন দক্ষতা, অর্থনৈতিক অবস্থা, ইত্যাদি বিষয়গুলোও এক্ষেত্রে প্রভাব ফেলতে পারে। এছাড়া, কেউ যখন অপরাধ করে পার পেয়ে যায় বা সমাজ থেকে দায়মুক্তি পায়, তখন সে সেটাকে নিজের অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে বা বিবেচনা করে।

নেপোলিয়নি কুখ্যাত একটি বিধির কথা আমরা স্মরণ করতে পারি, 'প্রতিটি পুরুষ তার নিজ গৃহে রাজা'। অর্থাৎ, ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকেও ধারণা করা যায়, পরিবারে যাই ঘটুক না কেন তা রাষ্ট্র এবং আইনের ঊর্ধ্বে চলে যেত। মনে করা হতো, নারী-পুরুষের সমানাধিকার নিছক পাগলামী। পরিতাপের বিষয়, নিজ গৃহে রাজা, স্বামী, পতি এগুলো আমাদের সমাজে এখনও বিরাজমান। সেজন্যই আমরা দেখে থাকি, ২০২৪ সালের বিবিএস প্রতিবেদন অনুযায়ী, এখনও ৭০ শতাংশ বিবাহিত নারী স্বামী বা শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়-স্বজন দ্বারা নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকেন। আর তার যদি শিশুবয়সে বিয়ে হয়, তবে তার নির্যাতনের মাত্রা নির্ভর করে তার বয়স কত কম তার উপরে। অর্থাৎ বয়স যত কম হয় নির্যাতনের মাত্রা সে অনুযায়ী বাড়তে থাকে। তার কারণ তিনি শিক্ষা, দ্বন্দ্ব সমাধান, যোগাযোগ দক্ষতা, বা কারিগরি দক্ষতা, ইত্যাদি বিষয়েও তার জীবনসঙ্গী থেকে অনেক গুণ পিছিয়ে থাকেন। যা তাকে দুর্বল থেকে দুর্বল অবস্থানের দিকে ঠেলে দিতে থাকে।

ক্ষতিকর জেন্ডার ভাবনা এবং নারী-পুরুষের অসম ক্ষমতাবিন্যাস অসামঞ্জস্যভাবে নারী এবং মেয়েশিশুদেরকে আঘাত হানে, যা তাদের শিক্ষার অধিকার, সুরক্ষা ও স্বাধীনতাসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাদের অধিকার হরণে ভূমিকা রাখে। এছাড়া গতানুগতিক ছাঁচে ঢালা সামাজিক রীতিনীতিগুলো নারীদের কী করতে হবে বা করা উচিত সে সম্পর্কে যে সীমাবদ্ধ প্রত্যাশা তৈরি করে, যা তাদের গণ্ডিকে সীমিত করে এবং সামনে এগিয়ে যেতে নিদারুণভাবে বাধা তৈরি করে। সর্বোপরি সে কী স্বপ্ন দেখবে তাতেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। মেয়েশিশুর সীমাবদ্ধ পৃথিবী তার স্বপ্নকে সীমাবদ্ধ করে।

আসুন, এমন একটি পৃথিবী গড়ি যেখানে প্রত্যেকটি শিশু সে ছেলে হোক বা মেয়ে হোক সকল কূপমণ্ডূকতাকে পেরিয়ে তার ইচ্ছে অনুযায়ী স্বপ্ন দেখবে এবং তা বাস্তবে রূপায়িত করবে।

লেখক: ম্যানেজার কমিউনিকেশন, এডুকো বাংলাদেশ।

সুব্রত ব্যানার্জী

❖ ধর্ষণ ও যৌন হয়রানি প্রতিরোধে করণীয় কী?

ধর্ষণ ও নারীর বিরুদ্ধে যৌন সহিংসতা নিয়ে এই বছরে আছিয়াকে ধর্ষণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীকে যৌন হয়রানি এবং সারা দেশে অস্বাভাবিক হারে ধর্ষণের ঘটনায় জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। ইতিবাচক ব্যাপার হলো, সারা দেশে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও এসব ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় জোড়ালো প্রতিবাদ করছে। ধর্ষকের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হতে হবে, ধর্ষককে শাস্তি পেতে হবে এ ধরনের দাবিও উঠেছিল। কিন্তু ব্যাপারগুলো নতুন নয়। বিগত কয়েকবছর ধরেই বাংলাদেশ নিয়মিত পরিণত হয়েছে 'ধর্ষণের সংস্কৃতিতে'। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দেশে গত কয়েক মাসে ৮০০ এর উপরে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে, যা পূর্বের রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। যখনই গুটি কয়েক ঘটনা মিডিয়ার মাধ্যমে প্রকাশ্যে আসে, তখনই আমরা প্রতিবাদ ও প্রতিক্রিয়া জানাই। ফলাফল, কয়েকদিনে সরকার-বিচার ব্যবস্থা খুব ক্রিয়াশীল হয়ে উঠে; জনমনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করা কয়েকটি ঘটনার দ্রুত দায়সারা বিচার করে মানুষের প্রতিক্রিয়াকে সামাল দিয়ে থাকে। কিন্তু সরকার পরবর্তীতে কি দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপ নিয়ে থাকে? ধর্ষণ ও নারীর বিরুদ্ধে যৌন সহিংসতার বিরুদ্ধে বিচার বিভাগের কোনো আলাদা অগ্রগতি চোখে পড়ে?

মূলত আমাদের জাতীয় পর্যায়ে কোনো সরকারই নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা বন্ধে দীর্ঘমেয়াদি কোনো কর্মপরিকল্পনা বা নীতি গ্রহণ করেনি। অথচ বিশ্বের উন্নতন দেশ যেমন, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা-সহ এশিয়ান অনেক দেশেই নারীর বিরুদ্ধে নির্যাতন প্রতিরোধে সুনির্দিষ্ট জাতীয় নীতি ও কর্মপরিকল্পনা রয়েছে। শুধু প্রতিবাদের ভিত্তিতে আইনে তদন্তের সময় ৩০ থেকে ১৫ দিনে আনলে কোনো কিছুরই পরিবর্তন হবে না। প্রয়োজন বাস্তবধর্মী কর্মপরিকল্পনা ও তার সঠিক বাস্তবায়ন। এ বিষয়ে আমার কিছু সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা রয়েছে, যা আমাদের দেশে ধর্ষণ ও নারীর বিরুদ্ধে যৌন সহিংসতা প্রতিরোধে জরুরি।

এক. কাঠামোগত প্রতিরোধ ও পরিবর্তন

সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ সমাজের কাঠামোগত পরিবর্তন। সমাজের প্রতিটি প্রতিষ্ঠান

যেমন, পরিবার, গোষ্ঠী, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, সামাজিক সংগঠন, অফিস-আদালতসহ কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা সম্পর্কে সঠিক শিক্ষা প্রদান করতে হবে এবং লিঙ্গ বৈষম্য দূর করার জন্য সরকারকে নীতি গ্রহণ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, একজন শিশু স্কুল থেকেই যেন নারীদের প্রতি সম্মানসূচক সম্পর্কগুলো সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং নারীদের প্রতি সঠিক আচরণ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। যৌন হয়রানির সংজ্ঞায়ন এবং এ সম্পর্কিত শিক্ষা যেন সে তার কিশোর বয়সেই পেয়ে থাকে। বর্তমানে আমাদের স্কুল-কলেজের পাঠ্যবইয়ে নারীদের প্রতি সম্মানসূচক আচরণ অথবা বয়ঃসন্ধিকালের শিক্ষাগুলোকে ট্যাবু হিসেবে ধরা হয়। নারী কোনো যৌনতার পণ্য নয়, নারী মননে-শক্তিতে পুরুষ থেকে নিচু স্তরের নয়, এ শিক্ষাগুলো দেওয়া খুব জরুরি।

অবাক বিষয় হলো, কাঠামোগত পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার জন্য অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, শিক্ষক অথবা 'উচ্চমার্গীয়' ব্যক্তিবর্গকেও বলতে শুনেছি পোশাক বা নারীর চাল-চলনের জন্য নারী ধর্ষণ বা যৌন হয়রানির শিকার হতে পারে। বিশাল মজলিসে নারীদের তুলনা করা হয় তেঁতুলের সঙ্গে, খোসাবৃত কলা অথবা মধুর সঙ্গে; যাদের নাকি বাইরে রাখলে যৌন হয়রানির শিকার হওয়াটাই স্বাভাবিক! আপনি যদি এসব জায়গায় বা দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তনের জন্য রাষ্ট্রীয় নীতি গ্রহণ না করেন, তাহলে ধর্ষণ বা নারী নির্যাতনের হার কমবে এই আশা করাটা বোকামি। এসবের ফলাফল একজন সম্ভাব্য ধর্ষকে মানুষ কারাগার থেকে ছাড়িয়ে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করবে অথবা যৌন হয়রানির সময় নারীর পাশে দাঁড়াবে না। এজন্য, একজন পুরুষকে সুস্থ পুরুষত্ব সম্পর্কে শেখাতে হবে, ছেলেদের 'পুরুষ হওয়া' মানে আগ্রাসন, আধিপত্য, নিয়ন্ত্রণ বা নারীর প্রতি ক্ষমতা প্রদর্শন নয়।

দুই. প্রাথমিক হস্তক্ষেপ

সহিংসতার সম্মুখীন বা সংঘটনের উচ্চ ঝুঁকিতে থাকা নারী ও শিশুদের শনাক্তকরণ এবং সে অনুযায়ী তাদের নিরাপত্তা প্রদান জরুরি। উদাহরণস্বরূপ, শুধু বাংলাদেশেই নয়, সারা বিশ্বেই ধর্ষণের শিকার সিংহভাগ ভিকটিম থাকে শিশু। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে শিশু ও প্রান্তিক নারীদের বিরুদ্ধে এই হার বেশি। যৌন সহিংসতার ঝুঁকিতে থাকা নারী ও শিশুদের চিহ্নিত করে তাদের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। এছাড়া যে শহর, বিভাগ বা লোকালয় ধর্ষণের 'হট স্পট' হয়ে ওঠছে সেসব ক্রমাগত চিহ্নিত করে এভিডেন্স-বেসড (প্রমাণভিত্তিক) পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, কয়েক বছর আগে চলন্ত বাসে নারীরা ধর্ষণের শিকার বেশি হচ্ছিল, বিষয়টি গুরুত্ব অনুধাবন করে সরকার যদি কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করত, তাহলে যানবাহনে যৌন হয়রানি ও ধর্ষণের ঘটনা কমিয়ে আনা যেত। কিন্তু সে রকম কোনো পুলিশিং বা পদক্ষেপ চোখে পড়েনি। আবার দেখুন, গত বছর বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন হয়রানি ও ধর্ষনের ঘটনাও উল্লেখযোগ্য ছিল। অসংখ্য ঘটনার মাঝে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে

এক দম্পতিকে ডেকে এনে স্বামীকে আবাসিক হলে আটকে স্ত্রীকে ধর্ষণ এবং সর্বশেষ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী শিক্ষার্থী অবন্তিকার আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যৌন হয়রানি ও নিপীড়নের বিষয়টি আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। ঘটনাপ্রবাহের পরও কি বাংলাদেশের ক্যাম্পাসগুলোতে বাড়তি কোনো সতর্কতা বা দৃশ্যমান পদক্ষেপ চোখে পড়েছে? যে কারণেই কিছুদিন আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পোশাক নিয়ে এক নারীকে হেনস্তার শিকার হতে হলো।

তিন. বিচার ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়া বা রেস্পন্স

সহিংসতার শিকার হওয়া ভুক্তভোগীদের সহায়তা করার জন্য পরিষেবা এবং সহায়তা প্রদানের দায়িত্বে থাকা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন, পুলিশ, আদালত, ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার, ভিকটিম সাপোর্ট সার্ভিস ও বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থার কার্যক্রম ও রেসপন্স কার্যকর হতে হবে। পুলিশ মামলা নিতে চায় না, ক্ষমতাবান দ্বারা প্রভাবিত হয়, সঠিক রেস্পন্স করতে ব্যর্থ হওয়া-সহ নানাবিধ অভিযোগ আছে। আদতে সব দোষ আমাদের পুলিশের উপর এসে পড়লেও গবেষণা করতে গিয়ে দেখেছি, ধর্ষণ ও যৌন হয়রানির মামলাগুলোর সবচেয়ে শুভঙ্করের ফাঁকির জায়গা হলো 'আদালত ও ট্রাইব্যুনাল'। নারী নির্যাতন বন্ধের যেসব আইন আছে দেশে তার মধ্য নারী ও 'শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০৩' যথেষ্ট শক্তিশালী। কিন্তু আইন শক্তিশালী হলেই যে বিচার যথাযথ হবে এটা ভাবা আমাদের দেশে অকল্পনীয়। ট্রাইব্যুনালে যাওয়ার পর ধর্ষণ ও নির্যাতনের মামলাগুলোর ৩ শতাংশেরও রায় হয় না। কোর্টের সমস্যাগুলো বহুবিধ। তারপরও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলো হলো ট্রাইব্যুনালগুলোতে মামলার তীব্র জট, সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাব, ট্রাইব্যুনালের অপ্রতুলতা, নারীদের পক্ষে মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে সাপোর্ট সার্ভিসের অভাব, দীর্ঘদিন আদালতে আসার ঝামেলা, মেডিকেল রিপোর্ট ও ফরেন্সিক রিপোর্টের দীর্ঘসূত্রতা, আদালতের সঙ্গে পুলিশ-হাসপাতাল-ভিকটিমের সমন্বয়নের অভাব, ইত্যাদি। আইনে ১৮০ দিনের মধ্যে মামলা শেষ করার বিধান থাকলেও বস্তুত মামলা চলতে থাকে বছরের পর বছর। এর থেকে বড় সমস্যা ভিকটিম প্রটেকশন আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন না থাকা। একটি ধর্ষণের ঘটনা পত্রিকায় আসার কিছুদিন পর আর কেউ ভিকটিম শিশু বা নারীর খোঁজ রাখেন না। মামলা চলমান থাকাবস্থায় ভিকটিম ও তার পরিবারকে হুমকি ও হয়রানি থেকে রক্ষা করার জন্য কোনো এজেন্সি বস্তুত কাজ করে না। এই ভয়, হুমকি ও সেকেন্ডারি ভিকটিমাইজশনের শঙ্কা নিয়ে কতজন নারী ও তার পরিবার বিচার ব্যবস্থায় তাদের মামরা দীর্ঘদিন চালাতে পারবে? এই জায়গাগুলো দেখার কেউ নেই! এসব কারণে অধিকাংশ সময় ভুক্তভোগী নারী তাদের অভিযোগ তুলে নেয় অথবা অপরাধীর সঙ্গে আপস করে নিতে বাধ্য হয়ে থাকে।

চার. নিরাময় ও পুনর্বাসন

ধর্ষণ অথবা যৌন হয়রানির শিকার হওয়ার পর ভিকটিম শারীরিক ও মানসিকভাবে

সমাজ বা রাষ্ট্রের কাছ থেকে কতটুকু 'নর্মালাইজ' হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে তা দেখার বিষয়। কখনও কখনও ভুক্তভোগী ও তার পরিবারকে উল্টো ভিক্টিম ব্লেমিং এর শিকার হতে হচ্ছে। সরকার ও সমাজের উচিত বিভিন্ন কমিউনিটি সচেতনামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে এ জায়গাগুলো এড্রেস করা, সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভুক্তভোগী ও তার পরিবারের পাশে এসে দাঁড়ানো। যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণের ফলে একজন নারী বা শিশু যে দীর্ঘস্থায়ী শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক ক্ষতির সম্মুখীন হয় তা থেকে উত্তরণের জন্য সরকারি সহায়তা অপ্রতুল। সরকারের উচিত নিরাময় ও পুনর্বাসনের জন্য আলাদা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার শুধু জেলা সদরে রয়েছে, প্রতিটি হাসপাতালে তাদের কার্যক্রম শুরু করা উচিত। ঢাকা বাদে অন্যান্য জেলা শহরে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার শুধু নামেমাত্র সহযোগিতা দিতে পারছে। কারণ তাদের জনবল অপ্রতুল।

পরিশেষে, ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়ন বন্ধে জাতীয় উদ্যোগ নিতে হবে এবং তার সঠিক বাস্তবায়নে পরিকল্পনা থাকতে হবে। নতুবা এই মহামারি থেকে বাংলাদেশকে সুরক্ষা করা কঠিন হবে।

লেখক: পিএইচডি গবেষক, অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ও সহযোগী অধ্যাপক, ক্রিমিনোলজি অ্যান্ড পুলিশ সায়েন্স বিভাগ, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

‘জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম’

‘জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম’ কন্যাশিশু তথা নারীর অবস্থা ও অবস্থানের ইতিবাচক পরিবর্তনে কর্মরত সমমনা সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের কাজের সমন্বয় এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম। কন্যাশিশুর প্রতি ইতিবাচক মনোভাব ও তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় গণসচেতনতা সৃষ্টি ও নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে অ্যাডভোকেসির জন্য এ ফোরাম-এর উদ্যোগে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

ফোরাম উদ্ভবের পটভূমি

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৪৫ শতাংশই ১৮ বছরের কম বয়সী শিশু, যার মধ্যে ৪৮ শতাংশই কন্যাশিশু (‘জাতীয় ই-তথ্যকোষ’-এর তথ্যানুযায়ী, বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২ কোটি ৩৯ লাখ জন কন্যাশিশু)। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও এদের অধিকাংশই জন্ম থেকে নানা বঞ্চনা ও বৈষম্যকে সঙ্গী করেই বেড়ে উঠছে। এতে তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে। ফলে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, দক্ষতা, আত্মবিশ্বাস ও সক্ষমতায় কন্যাশিশুরা ছেলেশিশুদের তুলনায় পিছিয়ে পড়ছে। এছাড়া কন্যাশিশুরা ব্যাপকভাবে যৌন সহিংসতার শিকার।

এই পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্য কন্যাশিশুর প্রতি প্রচলিত মানসিকতার পরিবর্তন ঘটানো প্রয়োজন। আমাদের উপলব্ধিতে আনা প্রয়োজন যে, কন্যাশিশুরা শুধু ভবিষ্যৎ মা-ই নয়, তারা জাতির সম্পদ। কন্যাশিশুদের শারীরিক-মানসিক বিকাশ ও সুরক্ষা, সুস্থ ও সুন্দরভাবে বেঁচে থাকা এবং তাদের সম-অংশগ্রহণের অধিকার প্রতিষ্ঠার ওপরই আমাদের জাতীয় অগ্রগতি বহুলাংশে নির্ভর করছে। তাই তাদের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দেয়াই হতে পারে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ।

এই বিশ্বাসবোধ থেকে ‘দি হাঙ্গার প্রজেক্ট’ কন্যাশিশুর অধিকার রক্ষা ও তাদের বিকাশের বিষয়টিকে বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলনে রূপ দেয়ার লক্ষ্যে ২০০০ সালে সরকারের কাছে কন্যাশিশু দিবস পালনের প্রস্তাব করে। এ প্রস্তাবে ৫৪টি বেসরকারি সংস্থা, কয়েকটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন ও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ পূর্ণ সমর্থন প্রদান করেন। ফলে ঐ বছরের ৪ জুন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে শিশু অধিকার সপ্তাহের দ্বিতীয় দিনকে ‘জাতীয় কন্যাশিশু দিবস’ ঘোষণা প্রদানের জন্য লিখিত প্রস্তাব করা হয়। পরবর্তীতে তৎকালীন সরকার ৩০ সেপ্টেম্বরকে ‘জাতীয় কন্যাশিশু দিবস’ পালনের ঘোষণা দেয়। এ ঘোষণার ফলে ২০০০ সাল থেকে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে দিবসটি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে সারাদেশে উদ্‌যাপিত হয়ে

আসছে। ফলে কন্যাশিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় সামাজিক সচেতনতা বাড়ছে। এই চেতনাকে তৃণমূলে নিয়ে যাওয়া ও দীর্ঘস্থায়ী রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উদ্যোগে ২০০২ সালে 'জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম' গড়ে তোলা হয়।

ফোরাম-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

লক্ষ্য:

কন্যাশিশুর প্রতি ইতিবাচক মনোভাব, তাদের জন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় গণসচেতনতা সৃষ্টি ও নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে অ্যাডভোকেসির জন্য ধারাবাহিক উদ্যোগ গ্রহণই ফোরাম-এর লক্ষ্য।

উদ্দেশ্য:

- পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র–সর্বস্তরে কন্যাশিশুর প্রতি প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে জনমত গঠন ও গণসচেতনতা সৃষ্টি করা;
- কন্যাশিশুর সার্বিক জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় অনুকূল নীতি-কাঠামো প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে ধারাবাহিক অ্যাডভোকেসি করা; এবং
- সরকারি-বেসরকারি সুযোগ ও সেবায় কন্যাশিশু ও নারীর অভিগম্যতা বৃদ্ধির জন্য সময়োপযোগী ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

ফোরাম-এর কার্যক্রম:

'জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম' কন্যাশিশুদের সার্বিক জীবনমানের ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নে সমগ্র বাংলাদেশে নিম্নোক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে:

ক. অ্যাডভোকেসি: কন্যাশিশু ও নারীর অনুকূল আইন, নীতি ও বিধি-বিধান প্রণয়ন, সংস্কার ও বাস্তবায়নে ধারাবাহিক ও পদ্ধতিগত অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিভিন্ন ইস্যুভিত্তিক গোলটেবিল বৈঠক, আলোচনা সভা, সেমিনার, মানববন্ধন ও কর্মশালা পরিচালনা করা হয়।

খ. প্রশিক্ষণ প্রদান: কন্যাশিশুদের জীবনভিত্তিক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়, যাতে তারা নিজেদের সমস্যা মোকাবেলায় দক্ষ ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে।

গ. কর্মশালা আয়োজন: স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন পেশাজীবী, সরকারি প্রতিনিধি ও অভিভাবকদের নিয়ে 'কন্যাশিশুর অধিকার ও আমাদের করণীয়' শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালা পরিচালনা করা হয়। বর্তমানে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে 'কন্যাশিশু সম্পদ, বোঝা নয়'– এ ধরনের ইতিবাচক মনোভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে।

ঘ. গণসচেতনতা সৃষ্টি: জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দিবস পালন, পোস্টার, লিফলেট ছাপানো ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। যেমন, রচনা, চিঠি লেখা, চিত্রাঙ্কন ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা। এছাড়া তৃণমূলে উঠান বৈঠক, শোভাযাত্রা, পথনাটক, গান ও অভিভাবক সমাবেশ পরিচালনা করা হয়।

ঙ. আইনি সহায়তা: অ্যাসিড সন্ত্রাস-সহ নির্যাতনের শিকার হওয়া কন্যাশিশুদেরকে ফোরাম-এর সদস্য সংগঠনসমূহের সহযোগিতায় প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা, আইনি পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করা হয়।

চ. যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন: নারী ও কন্যাশিশুর অধিকার নিয়ে কর্মরত সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/সংগঠনের সাথে কার্যকর যোগাযোগ গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে সমন্বয় সাধনপূর্বক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে ফোরাম-এর অর্জনসমূহ

স্থানীয় পর্যায়ে

নারী-পুরুষের বৈষম্যের সংস্কৃতি আমাদের সমাজে সুদীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে। কন্যাশিশুর প্রতি বঞ্চনা–এই বৈষম্যেরই বহিঃপ্রকাশ। এর মূলোৎপাটন এবং কন্যাশিশুর বিকাশে সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করার কাজটি একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। অল্প সময়ে তাই দৃশ্যমান ফলাফল তৈরি করাটা অত্যন্ত দুরূহ একটি কাজ। প্রাথমিক পর্যায়ে সমাজে সকল স্তরের জনগণের মধ্যে এ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আর কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম মূলত এ কাজটিই করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে ফোরাম বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন স্তরের দশ লক্ষাধিক নারী-পুরুষকে সম্পৃক্ত করেছে।

লক্ষণীয় যে, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন গণমাধ্যম এখন কন্যাশিশুদের স্বার্থ রক্ষার বিষয়ে বিগত সময়ের তুলনায় অনেক বেশি সোচ্চার। প্রিন্ট মিডিয়ায় বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ, ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় কন্যাশিশুদের অধিকার রক্ষার বিষয়ে বিভিন্ন টকশো'র আয়োজন এবং কন্যাশিশুদের বঞ্চনা ও নির্যাতনের ওপর প্রামাণ্য চিত্র তৈরি ও প্রদর্শন করায় জনসচেতনতা বাড়ছে। ফলে শিশুবিবাহের বিরুদ্ধে একটি সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে ওঠছে। ইতিমধ্যে স্বেচ্ছাব্রতীদের প্রচেষ্টায় এবং প্রশাসনের সহায়তায় কয়েক সহস্রাধিক শিশুবিবাহ বন্ধ ও যৌতুকমুক্ত বিয়ে নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

জাতীয় পর্যায়ে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের ফলাফল:

- জাতীয় কন্যাশিশু দিবস ঘোষণা: জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম-এর ধারাবাহিক অ্যাডভোকেসির ফলে ২০০০ সালে তৎকালীন সরকার কর্তৃক ৩০ সেপ্টেম্বরকে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস ঘোষণা করা হয়। বর্তমানে প্রতিবছর সরকারের সঙ্গে ফোরাম যৌথ উদ্যোগে দেশব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দিবসটি উদ্‌যাপন করছে।
- আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস: ২০১১ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক ১১ অক্টোবরকে 'আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস' ঘোষণা করে। এটি মূলত ফোরামেরই একটি অন্যতম অর্জন। কারণ কন্যাশিশুদের জন্য আলাদাভাবে একটি দিবস ঘোষণার জন্য জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরামই সর্বপ্রথম এবং দীর্ঘদিন ধরে অ্যাডভোকেসি-সহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে আসছে।

■ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১তে একটি আলাদা ধারা সংযোজন: ফোরাম-এর সুপারিশের ফলে 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১'-এর দ্বিতীয় ভাগে প্রথমবারের মত কন্যাশিশুর উন্নয়ন (ধারা ১৮) নামে একটি আলাদা ধারা সংযুক্ত করা হয়।

■ জাতীয় শিশুনীতি ২০১১'র মূলনীতিতে ধারা সংযোজন: জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত কমিটিতে জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরামকে সদস্য হিসেবে রাখা হয়। ফোরাম-এর সুপারিশের ফলে এ নীতির মূলনীতিতে 'কন্যাশিশুর প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন ও বৈষম্য দূরীকরণ' সংযোজন করা হয়।

■ বাল্যবিবাহ নিরোধকল্পে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১৭-২০৩০: জাতীয় কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণকল্পে মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটি-তে জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরামকে অন্তর্ভুক্ত করা।

■ বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ এবং বিধিমালা ২০১৮: বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ এবং বিধিমালা ২০১৮ প্রণয়নে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত ওয়ার্কিং কমিটিতে জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরামকে অন্তর্ভুক্ত করা এবং ফোরামের বেশকিছু সুপারিশ উক্ত আইন ও বিধিমালাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

■ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটির সদস্য: প্রস্তাবিত শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর গঠনের জন্য মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটিতে সদস্য হিসেবে ফোরাম কাজ করছে।

■ মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটির সদস্য: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটিতে জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরামকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

■ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক গঠিত কমিটির সদস্য: জাতীয় মানবাধিকার কমিশন দ্বারা গঠিত শিশু অধিকার সম্পর্কিত কমিটির সদস্য হিসেবে জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম অন্তর্ভুক্ত।

■ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটরি সদস্য: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সিসিএ কার্যালয়ের সাইবার অপরাধ প্রতিরোধে গঠিত কেন্দ্রীয় কমিটি এবং সরকারি বিভিন্ন সংস্থার সাথে একমাত্র বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১০ সদস্যবিশিষ্ট ওয়ার্কিং কমিটির একজন সদস্য হিসেবে জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম কাজ করেছে।

■ যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইনের খসড়া প্রণয়ন: সর্বস্তরে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে প্রস্তাবিত 'যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন' নামে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি আইন পানের লক্ষ্যে পার্লামেন্টরি ককাস অন চাইল্ড রাইটস কমিটির সঙ্গে এবং একইঙ্গে সাবেক ডেপুটি স্পিকারের পরামর্শ অনুযায়ী পার্লামেন্টরি লেজিসলেটিভ ডিভিশনের সঙ্গে জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম অ্যাডভোকেসি কাজ করেছে। ২০২৪ সালে লিড মিনিস্ট্রি হিসেবে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এই খসড়া আইনটিকে পূর্ণাঙ্গ

আইন হিসেবে পাস করানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। ফোরাম এই উদ্যোগের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে কাজ করেছে।

▪ বিভিন্ন নেটওয়ার্কের সদস্য: স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য হিসেবে 'গার্লস নট ব্রাইড অ্যালায়েন্স' ও 'চাইল্ড রাইটস অ্যাডভোকেসি কোয়ালিশন ইন বাংলাদেশ'-এর সদস্য হিসেবে ফোরাম কাজ করছে।

সাংগঠনিক কাঠামো

জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম-এর সাংগঠনিক কাঠামো দ্বি স্তর বিশিষ্ট:

ক) সাধারণ পরিষদ

খ) কার্যনির্বাহী পরিষদ।

সকল সাধারণ সদস্য নিয়ে সাধারণ পরিষদ গঠিত। সাধারণ সদস্যপদ গ্রহণে কেবলমাত্র সেই সকল সংগঠন বা ব্যক্তি আবেদন করতে পারবে যারা নারী ও কন্যাশিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করেন। সাধারণ পরিষদের প্রত্যেক সদস্য ফোরাম-এর বিধিমালা মোতাবেক নির্বাচনে একটি করে ভোট দিতে পারেন।

প্রতি দু বছর পর সাধারণ সদস্যদের সরাসরি ভোটে ফোরাম-এর কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠিত হয়। কার্যনিবাহী পরিষদ মূলত সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করে থাকে। উল্লেখ্য যে, ফোরামে তিন ধরনের সদস্য রয়েছে যেমন, সাধারণ পরিষদের সদস্য, নির্বাহী পরিষদের সদস্য এবং দাতা সদস্য। সকল সদস্যই সামাজিক দায়বদ্ধতা ও স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালনা করে।

স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে ফোরাম-এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়। স্থানীয় পর্যায়ে গড়ে ওঠা কাঠামো চ্যাপ্টার কমিটি নামে পরিচিত। নির্বাহী কমিটির সহযোগিতা ও পরামর্শ সাপেক্ষে চ্যাপ্টার কমিটি সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীলতার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে এই চ্যাপ্টার কমিটিসমূহ গড়ে ওঠে। বর্তমানে জেলা পর্যায়ে ২২টি; উপজেলা পর্যায়ে ৪১টি এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে ১৬৯টি চ্যাপ্টার কমিটি গড়ে ওঠেছে।

প্রয়োজন আপনার সম্পৃক্ততা এবং নেতৃত্ব:

চলমান বৈষম্যমূলক ব্যবস্থায় কেবল নারী বা কন্যাশিশুর বিকাশের সুযোগই শুধু রুদ্ধ হয়ে পড়ছে না, এর পরিণতি ভোগ করছে সকল মানুষ। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে, ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে। জাতি হিসেবে আমরা পিছিয়ে পড়ছি। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতার পরিবর্তন ঘটিয়ে কন্যাশিশুর জন্য সম-সুযোগ ও সম-বিকাশের সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সর্বস্তরের মানুষকে এর দায়িত্ব নিতে হবে। কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের এই আন্দোলনকে বেগবান করার জন্য আপনার ও আপনার সংগঠনের সম্পৃক্ততা জরুরি। আপনার অংশগ্রহণ, নেতৃত্ব ও নিবেদিত প্রচেষ্টাই

কন্যাশিশুর অধিকার নিশ্চিত করতে পারে। তাই আসুন, আমরা সকলে মিলে কন্যাশিশুর সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করি এবং তাদের জন্য একটি সহিংসতামুক্ত ও নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ে তুলি।

ফোরাম-এর অর্থায়ন:

জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম-এর সদস্য সংগঠন, সহযোগী সংগঠন এবং ফোরাম-এর ব্যক্তিগত সদস্যদের আর্থিক সহযোগিতায় সব কার্যক্রম পরিচালিত হয়। কন্যাশিশুদের প্রতি গভীর ভালবাসা এবং তাদের জন্য একটি নিরাপদ ভবিষ্যত সৃষ্টির লক্ষ্যে অংশীদারিত্বের নিদর্শন হিসেবে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠন এ ফোরামে বিনিয়োগ করে থাকেন। যার প্রতিদান হিসেবে তাঁরা দেখতে চান যথাযথ মর্যাদা, অধিকার এবং সার্বিক নিরাপত্তা নিয়ে কন্যাশিশুরা চলাচল করছে এবং তাদের বিকাশের জন্য একটি সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত হয়েছে। যেটি মূলত ক্ষুধামুক্ত ও আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ সৃষ্টির অন্যতম একটি পদক্ষেপ।

আপনি যে প্রক্রিয়ায় ফোরাম-এর সাথে যুক্ত হতে পারেন:

আপনি ব্যক্তিগতভাবে বা কোনো সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসেবে যুক্ত হতে পারেন। ফোরাম-এর সদস্যভুক্তির জন্য নির্দিষ্ট ফর্মে সদস্য ফি প্রদান সাপেক্ষে আবেদন করতে হবে। আবেদন ফর্মটি ফোরাম-এর সচিবালয় বা ফোরাম-এর ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করতে পারেন। নির্বাহী কমিটি কর্তৃক আবেদন ফর্মটি যাচাই- বাছাই সাপেক্ষে সদস্যপদ অনুমোদিত হয়।

উল্লেখ্য যে, ফোরাম কোনো লাভজনক প্রতিষ্ঠান নয়। তাই আপনাকে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে কাজ করার মানসিকতা নিয়ে ফোরাম-এর সাথে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম
সচিবালয়: দি হাঙ্গার প্রজেক্ট
২/২ (লেভেল: ফোর), ব্লক: এ
মিরপুর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা- ১২০৭।
ওয়েব: www.girlchildforum.org
ফেসবুক: www.facebook.com/ngcaf

জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম
বিভিন্ন কমিটির তালিকা

জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে যেসকল প্রতিষ্ঠান যুক্ত আছে (জেনারেল কমিটি সদস্য)

ক্রম	প্রতিষ্ঠানের নাম
১.	অপরাজেয় বাংলাদেশ
২.	একশনএইড বাংলাদেশ
৩.	ওয়াইডাব্লিউসিএ অব বাংলাদেশ
৪.	কারিতাস বাংলাদেশ
৫.	উদ্দীপন
৬.	গুডনেইবারস বাংলাদেশ
৭.	ঢাকা আহছানিয়া মিশন
৮.	নারীমৈত্রী
৯.	পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র
১০.	কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড বাংলাদেশ
১১.	অ্যাডুকেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন-এডুকো
১২.	বাংলাদেশ গার্ল গাইডস অ্যাসোসিয়েশন
১৩.	এসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশন
১৪.	ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ
১৫.	কেয়ার বাংলাদেশ
১৬.	ব্র্যাক
১৭.	সঞ্চয়িতা সমাজকল্যাণ সমিতি
১৮.	মানবী
১৯.	ভ্রাতৃসংঘ
২০.	মা-শিশু সোসাইটি
২১.	অ্যালায়েন্স ফর কোঅপারেশন এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ (একলাব)
২২.	ফ্রয়েবল অ্যাডুকেশন অ্যান্ড স্কুল সোসাইটি
২৩.	ভয়েস অব ডেস্টিটিউট
২৪.	বাংলাদেশ সোসাইটি ফর দ্য চেইঞ্জ অ্যান্ড অ্যাডভোকেসি নেক্সাস (বিস্ক্যান)
২৫.	অর্ণব হেলথ অ্যাডুকেশন অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন
২৬.	ফর ইউ ফর এভার (ফাইফে)

২৭.	রাইটস অ্যান্ড সাইট ফর চিল্ড্রেন (আরএসসি)
২৮.	মায়ের ডাক
২৯.	গোর্কি ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন
৩০.	কাজী ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন
৩১.	ইভেন্টফুল বাংলাদেশ সোসাইটি
৩২.	তরুণ ঐক্যজোট
৩৩.	ডেপ (ডেভেলপমেন্ট অ্যাডুকেশন অ্যান্ড পিস)
৩৪.	জেস ফাউন্ডেশন
৩৫.	অ্যাসোসিয়েশন টু এসিস্ট দ্য আন্ডার প্রিভিলেজড (এ্যাসাপ)
৩৬.	শাহিনুর ফাউন্ডেশন
৩৭.	সেফ জেনারেশন ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি
৩৮.	ন্যায়ের আলো সামাজিক সংগঠন বাংলাদেশ
৩৯.	সামাজিক উন্নয়ন ও পুনর্গঠন সংস্থা (সাড়া)
৪০.	সফর আলী ভূইয়া সংস্থা
৪১.	ভাটিয়ালি সমাজ কল্যাণ সংস্থা
৪২.	অপরাজিতা নারী সংগঠন
৪৩.	চিলড্রেন অ্যান্ড আর্থ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি
৪৪.	সোশ্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট ফর রুরাল ম্যাস
৪৫.	জননী সেবা সংস্থা
৪৬.	উদয়ন-বাংলাদেশ
৪৭.	আড়াই হাজার জন সংঘ (আজস)
৪৮.	সেবা মানিকগঞ্জ
৪৯.	সংযোগ
৫০.	সেবা
৫১.	সেন্টার ফর রুরাল চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট (সিআরসিডি)
৫২.	নোয়াইল নারী কল্যাণ সমিতি
৫৩.	প্রভাটি এলিভিয়েশন ফর ইয়ুথ ইন বাংলাদেশ
৫৪.	ইয়ুথ এক্সিলেন্ট সোসাইটি-ইয়েস ব্যাংলাদেশ
৫৫.	দেওভোগ সমাজ উন্নয়ন সংসদ
৫৬.	সহিদ সেবা সংস্থা (এসএসএস)
৫৭.	পল্লী ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (পি.ডি.এস)

৫৮.	ডেভেলপমেন্ট ফর ডিজঅ্যাডভান্টেজ পিপল (ডিডিপি)
৫৯.	সবুজ বাংলা উন্নয়ন সংস্থা (এসবিইউএস)
৬০.	তাজপুর নারী কল্যাণ সমিতি
৬১.	বাংলাদেশ নারী উন্নয়ন ও হস্তশিল্প ফাউন্ডেশন
৬২.	সুচিতা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা
৬৩.	হাতকোপা মহিলা কল্যাণ সমিতি
৬৪.	বেলাভূমি কল্যাণ ফাউন্ডেশন (বেলাভূমি)
৬৫.	বড়কুপট গণচেতনা ফাউন্ডেশন
৬৬.	সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড ফিউচার অ্যান্ড ইকোনমি
৬৭.	দোয়েল সংস্থা
৬৮.	ভুইগড় মহিলা কল্যাণ সমিতি
৬৯.	মৈত্রী মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র
৭০.	হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন
৭১.	বন্ধন সমাজ উনয়ন সংস্থা (বিএসইউএস)
৭২.	এসডিএস (শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি)
৭৩.	ভয়েস অব সাউথ বাংলাদেশ
৭৪.	রুরাল কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি
৭৫.	দলিত
৭৬.	নো স্মোকিং ক্লাব
৭৭.	সামাজিক উন্নয়ন ও পুনর্গঠন সংস্থা (সাড়া)
৭৮.	শাপলা মানবিক উন্নয়ন সংস্থা
৭৯.	হিউম্যান অ্যাডভান্সমেন্ট প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন (হেপি)
৮০.	পল্লী ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (পি.ডি.এস)
৮১.	সোশ্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট অ্যান্ড ভিলেজ ইকোনকি (সেভ)
৮২.	ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার
৮৩.	দি প্রিপ ট্রাস্ট
৮৪.	বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি
৮৫.	প্ল্যান ইন্ট্যারন্যাশনাল বাংলাদেশ
৮৬.	ব্রতী
৮৭.	কৈননীয়া
৮৮.	হীড বাংলাদেশ
৮৯.	সিসিডিবি

৯০.	অ্যাকশন ফর সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট (এএসডি)
৯১.	নারী উদ্যোগ কেন্দ্র
৯২.	রুম টু রিড বাংলাদেশ
৯৩.	টিএমএসএস
৯৪.	ভূইয়া ফাউন্ডেশন
৯৫.	সোসাইটি ফর নলেজ প্রমোশন অ্যান্ড রিসার্চ (এসকেপিআর)
৯৬.	স্টেপস টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট
৯৭.	ডনফোরাম
৯৮.	অপূর্ব মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লি.
৯৯.	আনন্দধারা বহুমুখী সমবায় সমিতি
১০০.	আমাদের প্রচেষ্টা
১০১.	ইসলামিক রিলিফ বাংলাদেশ
১০২.	এইচ. এস. অ্যাডুকেশন অ্যান্ড হেলথ সোসাইটি
১০৩.	চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম
১০৪.	দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ
১০৫.	সেন্টার ফর উইমেন অ্যান্ড চিল্ডেন স্ট্যাডিজ
১০৬.	স্যাপ-বাংলাদেশ
১০৭.	বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টনারশিপ সেন্টার (বিডিপিসি)
১০৮.	এইচ. এস. অ্যাডুকেশন অ্যান্ড হেলথ সোসাইটি
১০৯.	অ্যাকশন ইন সোস্যাল ডেভলপমেন্ট
১১০.	আস্থা (আত্ম উন্নয়ন ও কল্যাণ সংস্থা)
১১১.	ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম
১১২.	কোডার
১১৩.	নেবুলা হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি
১১৪.	অঙ্কুর আইসিটি ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এআইডিএফ)
১১৫.	বাংলাদেশ উইমেন্স হেলথ কোয়ালিশন (বিডাব্লিউএইচসি)
১১৬.	চ্যারিটি ফাউন্ডেশন
১১৭.	সোসাইটি ফর আপগ্রেডিং রুরাল অ্যান্ড আরবান ইকোনমি (সিউর)
১১৮.	মায়ের হাসি
১১৯.	উপমা পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (ইউপিএস)
১২০.	সোপান

১২১.	নাগরিক উদ্যোগ
১২২.	বিজয় ব্লাড ডোনেশন ক্লাব
১২৩.	নারী জাগরণ বহুমুখী সংস্থা
১২৪.	মীরপাড়া সমবায় সমিতি
১২৫.	সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড ফিউচার অ্যান্ড ইকনোমি (সেফ)
১২৬.	চেতনা মহিলা সংস্থা
১২৭.	অ্যাসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (এসডো)
১২৮.	দুঃস্থ বেকার কল্যাণ সমিতি
১২৯.	মহিলা উন্নয়ন সমিতি (মউস)
১৩০.	গোদনাইল সংস্থা
১৩১.	অর্গানাইজেশন অব এনভারমেন্টাল পলুশন প্রিভেনশন প্রোগাম (ওয়েপ)
১৩২.	কদমতলী নয়াপাড়া বহুমুখী সমবায় সমিতি
১৩৩.	পুর্বাশার আলো সমাজকল্যাণ সমিতি
১৩৪.	কল্যাণী সেবা প্রতিষ্ঠান
১৩৫.	স্পন্দন উন্নয়ন সংস্থা
১৩৬.	সাফ সংস্থা
১৩৭.	মুক্তাঙ্গন সমাজ কল্যাণ সংস্থা
১৩৮.	একতা দুঃস্থ মহিলা কল্যাণ সমিতি
১৩৯.	সপুরা দুঃস্থ মহিলা সমাজকল্যাণ সমিতি (এসডিএমএকেএস)
১৪০.	লাইফ সেন্টার (লোকাল ইনিশিয়েটিভ ফর এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার)
১৪১.	মুষ্টি সমাজ কল্যাণ সংস্থা
১৪২.	কাজী ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন
১৪৩.	নবজাগরণ সংস্থা (এনজেএস)
১৪৪.	টাগেট পিপলস ফর ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (টিপিডিএ)
১৪৫.	বাংলাদেশ পল্লী অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংস্থা (ব্রীডস)
১৪৬.	দি রিজিওন্যাল রিপোর্টিং সোসাইটি
১৪৭.	রোজ সমাজকল্যাণ সংস্থা
১৪৮.	টিপরদী বহুমুখী গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লি.

১৪৯.	উদ্দীপক
১৫০.	সুখের নীড় বাংলাদেশ
১৫১.	বন্ধন সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (বিএসডিপি)
১৫২.	যুব সমাজের আলো
১৫৩.	বেকার কল্যাণ সংস্থা (বেকস)
১৫৪.	আপন ফাউন্ডেশন
১৫৫.	দুঃস্থ কল্যাণ সংস্থা (দুকস)
১৫৬.	দেওভোগ সংঘ
১৫৭.	অগ্রগামী যুব সমাজ
১৫৮.	আশার আলো বাংলাদেশ
১৫৯.	আইলপাড়া জনকল্যাণ সমিতি
১৬০.	সাবজেক্ট হেলথ অ্যান্ড অ্যাডুকেশন ফাউন্ডেশন (সেফ)
১৬১.	নেটিভ ইভানজেলিকাল ক্রিশ্চিয়ান ট্রাস্ট
১৬২.	মৌচাক মহিলা সমাজকল্যাণ সমিতি
১৬৩.	হেল্প ফাউন্ডেশন
১৬৪.	ফোরাম ফর ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন
১৬৫.	দুঃস্থ নারী ও কন্যার শাহারা সেন্টার
১৬৬.	লফস রাজশাহী
১৬৭.	ব্যাপ্টিস্ট এইড বিবিসিএফ
১৬৮.	প্রত্যাশা সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা
১৬৯	পল্লী একতা উন্নয়ন সংস্থা (রুডো)
১৭০	এইড অর্গানাইজেশন
১৭১	লোকাল আইডিয়া ফর এমপাওয়ারমেন্ট (লাইফ)
১৭২	সেভ দ্য চিল্ড্রেন ইন বাংলাদেশ
১৭৩	বাংলাদেশ রুরাল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (বিআরডিএস)
১৭৪	ফোরাম ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন
১৭৫	সুরভী
১৭৬	ট্রেডক্রাফ্ট অক্সচেঞ্জ (গ্লোবালি ট্রান্সকম ট্রেড)
১৭৭	কম্প্যাশন ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
১৭৮	যমুনা বহুমূখী কল্যাণ সংস্থা
১৭৯	পউস ফাউন্ডেশন

জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম
কার্যনির্বাহী পরিষদ-২০২৩-২০২৬

ক্রম	নাম	পদবি	সংগঠনের নাম
১.	ড. বদিউল আলম মজুমদার	সভাপতি	সিনিয়র অ্যাডভাইজর, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট
২.	জনাব শাহীন আক্তার ডলি	সহ-সভাপতি	নির্বাহী পরিচালক, নারীমৈত্রী
৩.	পক্ষে: ড. বদিউল আলম মজুমদার (বর্তমানকার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদকাল পর্যন্ত)	সম্পাদক	দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ
৪	জনাব ওয়াহিদা বানু	সহ-সম্পাদক	নির্বাহী পরিচালক, অপরাজেয় বাংলাদেশ
৫	জনাব পূরবী তালুকদার	কোষাধ্যক্ষ	প্রোগ্রাম ম্যানেজার, বাংলাদেশ ওয়াইডব্লিউসিএ
৬	জনাব মনোয়ারা বেগম	সদস্য	সভাপতি, একতা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড
৭	জনাব আমরীন আফরোজ	সদস্য	পার্টনারশীপ ডেভলপমেন্ট ইউনিট, গুডনেইবারস বাংলাদেশ
৮	জনাব মো. জাহাঙ্গীর হোসেন	সদস্য	সভাপতি, কদমতলী নয়াপাড়া বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড
৯	জনাব স.ম. মেহেদি হাসান	সদস্য	পরিচালক, লাইফ সেন্টার
১০	জনাব খোন্দকার সহিদুল আলম	সদস্য	পরিচালক, হেল্প ফাউন্ডেশন
১১	অ্যাডভোকেট নিষাত সীমা	সদস্য	উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি

জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে যেসকল ব্যক্তি যুক্ত আছেন (জেনারেল কমিটি সদস্য)

ক্রম	ব্যক্তির নাম
১.	অ্যাডভোকেট আহসানুল করিম চৌধুরী
২.	অ্যাডভোকেট আনোয়ার হোসেন
৩.	ড. বদিউল আলম মজুমদার (উন্নয়নকর্মী, সমাজকর্মী ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক)
৪.	অ্যাডভোকেট সেলিম খান, ব্যবস্থাপক, আর কে গ্রুপ
৫.	আলহাজ্ব প্রিন্সিপাল আবুল বাশার (সমাজকর্মী)
৬.	জনাব জাহিদুল হক খান (উন্নয়নকর্মী)
৭.	জনাব লায়লা নাহার চৌধুরী (সমাজকর্মী)
৮.	জনাব ইয়াসমিন আরা বেবী (উন্নয়নকর্মী)
৯.	জনাব তাজিমা হোসেন মজুমদার (সংগঠক ও নারী উদ্যোক্তা)
১০.	জনাব মুর্শিকুল আলম (উন্নয়নকর্মী)
১১.	জনাব ওয়াহিদা বানু স্বপ্না, নির্বাহী পরিচালক, অপরাজেয় বাংলাদেশ
১২.	অ্যাডভোকেট ফাহমিদা আক্তার, জ্যেষ্ঠ আইনজীবী, ঢাকা জজকোর্ট ও কো-অর্ডিনেটর, ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি)
১৩.	ড. আলেয়া পারভীন, সহযোগী অধ্যাপক, সরকারি সংগীত কলেজ, ঢাকা
১৪.	অধ্যাপক ইফফাত আরা নার্গিস, প্রাক্তন মহাপরিচালক, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)
১৫.	ড. মোস্তাফিজুর রহমান, পরিচালক, গণস্বারক্ষতা অভিযান
১৬.	ড. রওশন জাহান (বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক)
১৭.	ডা. আসমা খাতুন
১৮.	জনাব শফুরা বেগম (নারী উদ্যোক্তা)
১৯.	জনাব সৈয়দা আহসানা জামান এ্যানী (উন্নয়নকর্মী)
২০.	জনাব লায়লা সাজিদ (সমাজকর্মী)
২১.	জনাব জাহানারা রহমান মনি (সমাজকর্মী)
২২.	জনাব নীলুফার বেগম (উন্নয়নকর্মী)
২৩.	জনাব রেহেনা খাতুন, ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক
২৪.	জনাব বিলকিস নাহার (নারী উদ্যোক্তা)
২৫.	জনাব মোস্তফা রহমান (উন্নয়নকর্মী)
২৬.	জনাব মনিরুজ্জামান সরকার (সমাজকর্মী)
২৭.	জনাব শাহিনা আক্তার (উন্নয়নকর্মী)
২৮.	জনাব শামীমা মুক্তা (উন্নয়নকর্মী)
২৯.	জনাব আমিনুল ইসলাম সুজন (লেখক ও সমাজকর্মী)
৩০.	জনাব তুহীন আলম (উন্নয়নকর্মী)

জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম
জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন কমিটি (চ্যাপ্টার কমিটি)

জেলা কমিটি

বাগেরহাট জেলা কমিটি, বাগেরহাট	জয়পুরহাট জেলা কমিটি, জয়পুরহাট
বরিশাল জেলা কমিটি, বরিশাল	কুড়িগ্রাম জেলা কমিটি, কুড়িগ্রাম
চুয়াডাঙ্গা জেলা কমিটি, চুয়াডাঙ্গা	লালমনিরহাট জেলা কমিটি, লালমনিরহাট
ঝিনাইদহ জেলা কমিটি, ঝিনাইদহ	নাটোর জেলা কমিটি, নাটোর
খুলনা জেলা কমিটি, খুলনা	পাবনা জেলা কমিটি, পাবনা
কুষ্টিয়া জেলা কমিটি, কুষ্টিয়া	রাজশাহী জেলা কমিটি, রাজশাহী
মাগুরা জেলা কমিটি, মাগুরা	মাদারীপুর জেলা কমিটি, মাদারীপুর
নওগাঁ জেলা কমিটি, নঁওগা	ঝালকাঠী জেলা কমিটি, ঝালকাঠি
নড়াইল জেলা কমিটি, নড়াইল	মেহেরপুর জেলা কমিটি, মেহেরপুর
কক্সবাজার জেলা কমিটি, কক্সবাজার	ফরিদপুর জেলা কমিটি, ফরিদপুর
সাতক্ষীরা জেলা কমিটি, সাতক্ষীরা	কুমিল্লা জেলা কমিটি, কুমিল্লা
কিশোরগঞ্জ জেলা কমিটি, কিশোরগঞ্জ	ময়মনসিংহ জেলা কমিটি, ময়মনসিংহ
টাঙ্গাইল জেলা কমিটি, টাঙ্গাইল	নেত্রকোণা জেলা কমিটি, নেত্রকোনা
রংপুর জেলা কমিটি, রংপুর	যশোর জেলা কমিটি, যশোর
নারায়ণগঞ্জ জেলা কমিটি, নারায়ণগঞ্জ	মানিকগঞ্জ জেলা কমিটি, মানিকগঞ্জ
গাজীপুর জেলা কমিটি, গাজীপুর	খাগড়াছড়ি জেলা কমিটি, চট্টগ্রাম

জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম
জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন কমিটি (চ্যাপ্টার কমিটি)

উপজেলা কমিটি

বাবুগঞ্জ উপজেলা কমিটি, বরিশাল	কেন্দুয়া উপজেলা কমিটি, নেত্রকোণা
চৌদ্দগ্রাম উপজেলা কমিটি, কুমিল্লা	দুর্গাপুর উপজেলা কমিটি, নেত্রকোণা
শ্যামনগর উপজেলা কমিটি, সাতক্ষীরা	মির্জাপুর উপজেলা কমিটি, টাঙ্গাইল
অভয়নগর উপজেলা কমিটি, যশোর	মধুপুর উপজেলা কমিটি, টাঙ্গাইল
গুরুদাসপুর উপজেলা কমিটি, নাটোর	নাগরপুর উপজেলা কমিটি, টাঙ্গাইল
বটিয়াঘাটা উপজেলা কমিটি, খুলনা	নান্দাইল উপজেলা কমিটি, ময়মনসিংহ
কাঠালিয়া উপজেলা কমিটি, ঝালকাঠি	চারঘাট উপজেলা কমিটি, রাজশাহী
পাঁচবিবি উপজেলা কমিটি, জয়পুরহাট	কুড়িগ্রাম সদর উপজেলা কমিটি, কুড়িগ্রাম
কটিয়াদী উপজেলা কমিটি, কিশোরগঞ্জ	কলমাকান্দা উপজেলা কমিটি, নেত্রকোনা
নাগেশ্বরী উপজেলা কমিটি, কুড়িগ্রাম	রৌমারী উপজেলা কমিটি, কুড়িগ্রাম
গোপালপুর উপজেলা কমিটি, টাঙ্গাইল	আটপাড়া উপজেলা কমিটি, নেত্রকোনা
সিংগাইর উপজেলা কমিটি, মানিকগঞ্জ	দৌলতপুর উপজেলা কমিটি, কুষ্টিয়া
খোকসা উপজেলা কমিটি, কুষ্টিয়া	শরীয়তপুর সদর উপজেলা কমিটি, শরীয়তপুর
আগৈলঝাড়া উপজেলা কমিটি, বরিশাল	লাকসাম উপজেলা কমিটি, কুমিল্লা
মাদারীপুর সদর উপজেলা কমিটি, বরিশাল	মণিরামপুর উপজেলা কমিটি, যশোর
লক্ষ্মীগঞ্জ উপজেলা কমিটি, নেত্রকোণা	করিমগঞ্জ উপজেলা কমিটি, কিশোরগঞ্জ
মোহনপুর উপজেলা কমিটি, রাজশাহী	জাহাঙ্গীরপুর উপজেলা কমিটি, নান্দাইল, ময়মনসিংহ
বদরগঞ্জ উপজেলা কমিটি, রংপুর	ঘাটাইল উপজেলা কমিটি, টাঙ্গাইল
আগৈলঝাড়া উপজেলা কমিটি, বরিশাল	লামা উপজেলা কমিটি, বান্দরবান
কালিহাতী উপজেলা কমিটি, টাঙ্গাইল	উল্লাপাড়া উপজেলা কমিটি, সিরাজগঞ্জ
খুবজীপুর উপজেলা কমিটি, নাটোর	মনিরামপুর উপজেলা কমিটি
গাংনী উপজেলা কমিটি, মেহেরপুর	ডুমুরিয়া উপজেলা কমিটি
পাংশা উপজেলা কমিটি	কালুখালি উপজেলা কমিটি

ইউনিয়ন কমিটি

মাধবপাশা ইউনিয়ন কমিটি
চাঁদপাশা ইউনিয়ন কমিটি
বাকাল ইউনিয়ন কমিটি
কেওড়া ইউনিয়ন কমিটি
উত্তরদা ইউনিয়ন কমিটি
মৈশাতুয়া ইউনিয়ন কমিটি
আদ্রা ইউনিয়ন কমিটি
ঢেমুশিয়া ইউনিয়ন কমিটি
জাফরাবাদ ইউনিয়ন কমিটি
কাদিরজঙ্গল ইউনিয়ন কমিটি
ঘটমাঝি ইউনিয়ন কমিটি
দীঘি ইউনিয়ন কমিটি
পঞ্চসার ইউনিয়ন কমিটি
চর নিলক্ষীয়া ইউনিয়ন কমিটি
চর ঈশ্বরদিয়া ইউনিয়ন কমিটি
কুষ্টিয়া ইউনিয়ন কমিটি
ভাবখালি ইউনিয়ন কমিটি
জাহাঙ্গীরপুর ইউনিয়ন কমিটি
সিংহের বাংলা ইউনিয়ন কমিটি
মৃগী ইউনিয়ন কমিটি
নিকরাইল ইউনিয়ন কমিটি
ঝাওয়াইল ইউনিয়ন কমিটি
দামিহা ইউনিয়ন কমিটি
বেতাগা ইউনিয়ন কমিটি
ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন কমিটি
রহমতপুর ইউনিয়ন কমিটি
দেহেরগাতি ইউনিয়ন কমিটি
রাজিহার ইউনিয়ন কমিটি
কীর্তিপাশা ইউনিয়ন কমিটি
আজগড়া ইউনিয়ন কমিটি
ঝলম উত্তর ইউনিয়ন কমিটি
হেসাখাল ইউনিয়ন কমিটি
কোনাখালী ইউনিয়ন কমিটি
গুজাদিয়া ইউনিয়ন কমিটি
দেহুন্দা ইউনিয়ন কমিটি
পিয়ারপুর ইউনিয়ন কমিটি
গড়পাড়া ইউনিয়ন কমিটি
রামপাল ইউনিয়ন কমিটি
খাগডহর ইউনিয়ন কমিটি
বয়ড়া ইউনিয়ন কমিটি
দাপুনিয়া ইউনিয়ন কমিটি
ঘোগা ইউনিয়ন কমিটি
চল্লিশা ইউনিয়ন কমিটি
পাট্টা ইউনিয়ন কমিটি
ফলদা ইউনিয়ন কমিটি
অলোয়া ইউনিয়ন কমিটি
হেমনগর ইউনিয়ন কমিটি
দিগদাইড় ইউনিয়ন কমিটি
শুভদিয়া ইউনিয়ন কমিটি
মনোহরপুর ইউনিয়ন কমিটি

দুর্বাডাঙ্গা ইউনিয়ন কমিটি
বটিয়াঘাটা ইউনিয়ন কমিটি
বড়খাদা ইউনিয়ন কমিটি
মটমুড়া ইউনিয়ন কমিটি
তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন কমিটি
সাহারবাটি ইউনিয়ন কমিটি
ধানখোলা ইউনিয়ন কমিটি
মৃগী ইউনিয়ন কমিটি
সাহস ইউনিয়ন কমিটি
শোভনা ইউনিয়ন কমিটি
রুদাঘরা ইউনিয়ন কমিটি
বিষ্ণুপুর ইউনিয়ন কমিটি
দক্ষিণ শ্রীপুর ইউনিয়ন কমিটি
মিঠাখালী ইউনিয়ন কমিটি
রায়েন্দা ইউনিয়ন কমিটি
ফকিরহাট ইউনিয়ন কমিটি
খুবজীপুর ইউনিয়ন কমিটি
পত্নীতলা ইউনিয়ন কমিটি
দিবর ইউনিয়ন কমিটি
মাটিন্দর ইউনিয়ন কমিটি
পাটিচড়া ইউনিয়ন কমিটি
ঘোষনগর ইউনিয়ন কমিটি
শিহাড়া ইউনিয়ন কমিটি
দুলাই ইউনিয়ন কমিটি
মৌগাছি ইউনিয়ন কমিটি
জাহানাবাদ ইউনিয়ন কমিটি
সরদহ ইউনিয়ন কমিটি
খালিশাচাপানী ইউনিয়ন কমিটি
জলমা ইউনিয়ন কমিটি
বাট্টাইল ইউনিয়ন কমিটি
ষোলটাকা ইউনিয়ন কমিটি
বামুন্দী ইউনিয়ন কমিটি
কাজিপুর ইউনিয়ন কমিটি
কাথুলী ইউনিয়ন কমিটি
রায়পুর ইউনিয়ন কমিটি
পাট্টা ইউনিয়ন কমিটি
মাগুরখালী ইউনিয়ন কমিটি
খর্ণিয়া ইউনিয়ন কমিটি
রঘুনাথপুর ইউনিয়ন কমিটি
কৃষ্ণনগর ইউনিয়ন কমিটি
মৌতলা ইউনিয়ন কমিটি
বুড়িরডাঙ্গা ইউনিয়ন কমিটি
সাউথখালি ইউনিয়ন কমিটি
বাহিরদিয়া মনসা ইউনিয়ন কমিটি
ধারাবারিষা ইউনিয়ন কমিটি
নিরমইল ইউনিয়ন কমিটি
আকবরপুর ইউনিয়ন কমিটি
কৃষ্ণপুর ইউনিয়ন কমিটি
নজিরপুর ইউনিয়ন কমিটি
আমাইড় ইউনিয়ন কমিটি
মহাদেবপুর ইউনিয়ন কমিটি
সাগরকান্দি ইউনিয়ন কমিটি
ধুরইল ইউনিয়ন কমিটি
বাকশিমইল ইউনিয়ন কমিটি
ভায়ালক্ষ্মীপুর ইউনিয়ন কমিটি
নোহালী ইউনিয়ন কমিটি

কোলকোন্দা ইউনিয়ন কমিটি
বেতগাড়ি ইউনিয়ন কমিটি
চতরা ইউনিয়ন কমিটি
মিরপুর ইউনিয়ন কমিটি
বাহুবল ইউনিয়ন কমিটি
গোপায়া ইউনিয়ন কমিটি
লস্করপুর ইউনিয়ন কমিটি
নবীগঞ্জ সদর ইউনিয়ন কমিটি
পুটিজুরী ইউনিয়ন কমিটি
দক্ষিণ খুরমা ইউনিয়ন কমিটি
পশ্চিম পাগলা ইউনিয়ন কমিটি
পাথারিয়া ইউনিয়ন কমিটি
মাগুরখালী ইউনিয়ন কমিটি
ডুমুরিয়া ইউনিয়ন কমিটি
জামালগঞ্জ ইউনিয়ন কমিটি
লক্ষ্মীটারী ইউনিয়ন কমিটি
গজঘণ্টা ইউনিয়ন কমিটি
কাবিলপুর ইউনিয়ন কমিটি
সিংচাপৈর ইউনিয়ন কমিটি
সাতকাপন ইউনিয়ন কমিটি
নিজামপুর ইউনিয়ন কমিটি
পৈল ইউনিয়ন কমিটি
গংগাচড়া ইউনিয়ন কমিটি
আলমবিদিতর ইউনিয়ন কমিটি
চরমহল্লা ইউনিয়ন কমিটি
দরগাপাশা ইউনিয়ন কমিটি
ফেনারবাগ ইউনিয়ন কমিটি
মাগুরঘোনা ইউনিয়ন কমিটি
আটলিয়া ইউনিয়ন কমিটি